সাহিত্য দীপিকা

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI Vide Notification No. T. B 74/VI/T.B. 21 and also Board's Letter No. 10367/G. Dated 24 11.75.

সাহিত্য দীপিকা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রী[illegible] মিত্র, এম. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, কাঁথিনন্দী ইউনিয়ন হাইস্কুল, মেদিনীপুর

ও

শ্রীপরিমলকান্তি হালদার, এম. কম., বি. টি.
দেওয়ানগঞ্জ জাঙ্গালিয়া হাইস্কুল, চব্বিশ পরগণা

দীপিকা
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৬এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ—শুভ জন্মাষ্টমী
সন ১৩৪০, ২৪শে কার্তিক
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৮২ সাল
তৃতীয় সংস্করণ—১৩৮৩ সাল
চতুর্থ সংস্করণ—১৩৮৫ „
পঞ্চম সংস্করণ—১৩৮৬ „
ষষ্ঠ সংস্করণ—১৩৮৭ „
সপ্তম সংস্করণ—১৩৮৮ „

মূল্য : টা. ৩·৩০

প্রকাশক : প্রদীপ সেনগুপ্ত, ১৬এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯।

মুদ্রাকর : শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ঘোষ প্রিণ্টার্স, ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



শিক্ষা

মহাত্মা গান্ধী

চরিত্র গঠন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন যে, যে আত্মাকে জানিয়াছে সে সকলই জানিয়াছে। বই পড়া বিদ্যা না থাকিলেও আত্মজ্ঞান হওয়া সম্ভব। পয়গম্বর মহম্মদ সাহেবের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। যীশুখ্রীষ্ট কোনও পাঠশালায় বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন না, তাহা হইলেও এই মহাত্মাগণের আত্মজ্ঞান ছিল না বলিলে ধৃষ্টতাই হয়। তাঁহারা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা না দিলেও আমরা তাঁহাদিগকে পূজনীয় বলি। বিদ্যায় যত ফল তাহা সমস্তই তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহারা মহাত্মা ছিলেন। যদি তাঁহাদের দেখাদেখি আমরা বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিই তাহা হইলে আমরা ভ্রষ্ট হইব।

শিক্ষাকে জীবিকা উপার্জনের পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমার সামান্য বুদ্ধিতে নীচ বৃত্তি বলিয়া বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের সাধন হইতেছে শরীর, আর বিদ্যালয় হইতেছে চরিত্র গঠনের সাধন। আমি একথাও বলি না যে, ঐ বই-পড়া বিদ্যাশিক্ষার দরকার নাই। কেবল এই বলি যে, ঐ বিদ্যাটার জন্য অধীর হইয়া পড়িও না। যাহাতে পরের সেবা করিতে পার সেই উদ্দেশ্যেই শিক্ষা লাভ করা দরকার।

আমাদের স্কুলগুলিতে রাজমিস্ত্রী, কামার, ছুতার, দরজি, মুচি ইত্যাদি জাতের ছেলেরা পড়িতে আসিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু বিদ্যা শিখিয়া তাহাদের পিতৃ-পুরুষের ব্যবসা বাড়াইবার বদলে ঐ সকল ব্যবসা ছোট কাজ মনে করিয়া যে তাহারা উহা ছাড়িয়া দেয় ও কেরাণীগিরি পাইলেই উহা সম্মানজনক মনে করে, যদি তাহাদের মা-বাবাও এই রকমই ভাবে, তবে আমরা জাতিভ্রষ্ট ও কার্য-ভ্রষ্ট হইয়া গোলামগিরিতে নামিয়া যাইব।

শিক্ষা মানে কি? যদি শিক্ষা মানে বই-পড়া-বিদ্যাই হয় তবে ত উহা এক

অস্ত্রের মতই হইল। উহা সদ্ব্যবহার হইতে পারে—অসদ্ব্যবহারও হইতে পারে। এক অস্ত্র দিয়া অস্ত্রোপচার করিয়া রোগীকে সুস্থ করা যায়, আবার সেই অস্ত্র লোকের প্রাণ হত্যা করার জন্যও ব্যবহার করা যায়। শিক্ষা মানে অক্ষর জানা নয়, বই-পড়া বিদ্যা নয়, উহার মানে চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলা, ধর্মভাবের জ্ঞান লাভ করা।

মানুষের প্রকৃত কাজই হইতেছে কি করিয়া নিজের চরিত্র গড়া যায় তাহাই শিক্ষা করা। রোজগারের জন্য বিশেষ কিছু শিখিয়া লওয়া তাহার কাজ নহে।

পরোপকার করা, পরের সেবা করা ও সেবা করিতে গিয়া নিজেকে এতটুকুও বড় না মনে করা ইহাতেই সত্য শিক্ষা রহিয়াছে। যতই তোমাদের বয়স বাড়িবে ততই ইহা বেশী বুঝিবে। পীড়িতের সেবা করার মত উত্তম কার্য আর কি আছে? উহাতে সকল ধর্মের সমাবেশ রহিয়াছে।

যে নিজের কর্তব্য কর্ম করিতে থাকে সে সর্বদা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। তোমরা সেবা করার অভ্যাস করিতেছ। সেবা করিতে গিয়া যদি অক্ষর জ্ঞান, বই-পড়া-বিদ্যা বিসর্জন দেওয়া যায় তবে তাহাতে ক্ষতি নাই। বই-পড়া-বিদ্যা পরেও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেবা করার অবকাশ পরে নাও আসিতে পারে। যদি নিজের মনে এইটা গভীরভাবে আঁকিয়া লইতে পার যে তোমার মন নির্মল থাকিলে তবে সেবা করিবার কাজে ব্যারামে পড়িবে না। আর যদি পড়ও তবে নিশ্চিন্ত থাকিবে। ভাল জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করাই বিদ্যাভ্যাস, আর সকলই মিথ্যাভ্যাস বা মিথ্যার পাঠ লওয়া।

[* প্রবন্ধটি ইংরাজীতে গান্ধীজী কর্তৃক লিখিত, পরে বাংলায় অনুদিত।]

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? বই পড়া বিদ্যা না থাকিলেও যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইজন মহাপুরুষের নাম কর।

(খ) গান্ধীজীর মতে জীবিকা উপার্জনের সাধন কি? আর বিদ্যালয়ই বা কিসের সাধন?

(গ) আমরা কি মনে করি যে জাতিভ্রষ্ট ও কার্যভ্রষ্ট হইয়া গোলামগিরিতে নামিয়া যাইব?

(ঘ) সত্য শিক্ষা কিসে রহিয়াছে ? কি মনোভাব লইয়া পরোপকার ও পরের সেবা করা উচিত ?

(ঙ) সর্বাপেক্ষা উত্তম কার্য কি ? কেন উহাকে উত্তম কার্য বলা হয় ?

(চ) সেবা করিতে গিয়া যদি বই পড়া বিদ্যা বিসর্জন দিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই কেন ? প্রকৃত বিদ্যাভ্যাস কি ?

২। **সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ**

ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) অস্ত্র দিয়া……ব্যবহার করা যায়।

(খ) ভাল জীবন যাপন……পাঠ লওয়া।

৩। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

শিক্ষাকে — উপার্জনের পথ বলিয়া ধরিয়া লওয়া আমার সামান্য — নীচ — বলিয়া বোধ হয়। জীবিকা উপার্জনের সাধন হইতেছে —, আর — হইতেছে চরিত্র গঠনের —।

(শরীর, সাধন, বুদ্ধিতে, বৃত্তি, জীবিকা, বিদ্যালয়, অধীর, বিদ্যাভ্যাস।)

(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলি লইয়া বাক্য রচনা কর ঃ

পুনঃ পুনঃ, জাতিভ্রষ্ট, আত্মজ্ঞান, সমাবেশ, কর্তব্য, গোলামগিরি।

৪। **ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ**

(ক) অর্থ লিখ ঃ সদ্ব্যবহার, ছুতার, ব্যারাম, পীড়িত, নিশ্চয়, নির্মল, অবকাশ, ধৃষ্টতা।

(খ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ

উপকার, রোগী, উত্তম, মহাত্মা, ধীর, নীচ, বিসর্জন।

———



চিত্তরঞ্জনের উদারতা

ঋষি দাস

যীশুখ্রীষ্ট যে বলেছিলেন—"তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা দিবে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিবে না।"

চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে এই বাণী যতোখানি কার্যকর হয়েছিল, তেমনি সচরাচর দেখা যায় না। তিনি কতো আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত ও অপরিচিত দুঃস্থ পরিবারকে যে নিয়মিত সাহায্য দান করতেন, তার সীমা-সংখ্যা নেই। কোন প্রতারক তাঁকে প্রতারণা ক'রে নিয়ে গেলেও তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হতেন না। তিনি বলতেন, "আমার আছে দিয়েছি, ওর নেওয়ার প্রয়োজন আছে, ও নিয়েছে।" দানে তিনি পাত্র-অপাত্র বিচার করতেন না। তিনি যখন জেলে ছিলেন, তখন মাথুর নামে এক ডাকাতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। ঐ ডাকাতটি জেল থেকে মুক্তি পেলে তিনি তাকে নিজ গৃহে ভৃত্যের চাকরি দিয়েছিলেন। মাথুরকে নিয়ে বাড়ীর সকলেই প্রায় ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন বলতেন, ওকে ডাকাত ডাকাত ব'লে, দূরে সরিয়ে রাখলে ও ডাকাতই রয়ে যাবে, ও আর মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে না। অবশ্য অনেকদিন পরে ওই মাথুর চিত্তরঞ্জনের গৃহের বহুমূল্য রৌপ্য-পাত্রাদি নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। তাতেও চিত্তরঞ্জন এতো-টুকুও বিচলিত হননি, পুলিশেও খবর দেননি—পাছে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার ক'রে আবার জেলে ঢোকায়। চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের এই দিকটি সহজেই ভিক্টর হিউগোর 'লে মিজারেবল' কাহিনীর সেই বিখ্যাত বিশপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মানুষকে অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবাকে তিনি মহাপাপ মনে করতেন। পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদের প্রতি যে অবিচার হয় তা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত করতো। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরোধী যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছিলেন,

তার দ্বারা চিত্তরঞ্জনের প্রভাবিত হওয়ার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর স্বভাবজাত মানবপ্রেম ও মানবপ্রেমের ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মই তাঁকে সে বিষয়ে সক্রিয় করেছিল। এক নমঃশূদ্র জাতীয় আন্দোলন কালে চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে ছিল। তাকে অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়রূপে ফাঁকে খেতে দেওয়া হ'তো। চিত্তরঞ্জন তাতে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং একদিন নিজের কক্ষে নিয়ে খেতে বসলেন। এর পর বাড়ীর সকলেই তাঁদের ত্রুটি বুঝতে পারলেন।

তিনি সাধারণ মানুষকে যে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, সে সম্পর্কে আরও দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মাতৃবিয়োগের পর পিতা ভুবনমোহন আশা প্রকাশ করেন যে, নিস্তারিণী দেবী গরীব-কাঙালকে খুবই ভালোবাসতেন, তাই দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত লাভ করবে। ফলে মায়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে চিত্তরঞ্জন দরিদ্রনারায়ণ সেবার আয়োজন করেন। এ বিষয়ে তিনি স্থানীয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেন। ঐ ভদ্রলোক তাঁকে বলেন যে, গরীব-দুঃখীদের খাওয়ার জন্য উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের মতো আহারের ব্যবস্থা করার কি প্রয়োজন, তারা তো চিড়ে-মুড়কি, দই পেলেই বর্তে যাবে। ভদ্রলোকের এই কথায় চিত্তরঞ্জন খুবই মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন, "তা হ'লে আপনার বাড়ী নিমন্ত্রণে খাওয়া আমার চলে না। কারণ, কেউ খেলে সে বর্তে যাবে, এমন কথা যখন আপনি ভাবেন। মানুষ দরিদ্র হ'লেও তিনি যে এসে আহার করবেন, তাতে নিমন্ত্রণকারীরই কৃতার্থ হওয়া উচিত।" এই অসামান্য মনোভাব পোষণ করতেন চিত্তরঞ্জন।

সত্যই, প্রকৃত বৈষ্ণব সুলভ বিনয় চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের একটি অসাধারণ দিক। তাঁর কন্যা অপর্ণা দেবী তাঁর বিবাহ-প্রসঙ্গেও যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন, তাও এই সুমহান চরিত্রকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। অপর্ণা দেবী সস্নেহ পরিহাসচ্ছলেই বলেছেন, তাঁর বিয়ের সময় চিত্তরঞ্জন বাইরের লোকের হাতেই এই বিপুল ভোজন-যজ্ঞের ভার তুলে দিয়েছিলেন। এতে দেখা গেল, আহার্য প্রস্তুতকালেই প্রায় ছ-সাত মণ মাংস চুরি গেল। চিত্তরঞ্জনকে এই সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না, শুধু বাজার থেকে প্রয়োজন মতো মাংস কিনে আনবার হুকুম দিয়ে ক্ষান্ত হলেন। আহারের সময়ে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ার আগেই দলে দলে অনিমন্ত্রিতরা এসে খেয়ে যেতে লাগলো। এতে সকলেই বিব্রত ও বিরক্ত হলেন। এই সংবাদ শুনে চিত্তরঞ্জন বিব্রত হওয়া দূরের কথা, আনন্দের সঙ্গেই বললেন, "ভালোই তো, আমি ওদের নিমন্ত্রণ করবার সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করতাম। ওরা যে যেচে এসে আহার গ্রহণ করছেন, তা তো আনন্দের কথা।" যতোই অর্থ-সামর্থ্য থাক, এ ধরনের বিশাল হৃদয় কোন্ দেশে ক'জন কর্মকর্তার মধ্যে দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) 'চিত্তরঞ্জনের উদারতা' প্রবন্ধ হইতে চিত্তরঞ্জনের উদারতার যে কোন দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

(খ) "মানুষকে অস্পৃশ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবাকে তিনি মহাপাপ মনে করতেন।" কোন্ ব্যক্তি এইরূপ মহাপাপ মনে করতেন, একটি উদাহরণ দ্বারা এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ কর।

(গ) "মানুষ দরিদ্র হলেও তিনি যে এসে আহার করবেন, তাতে নিমন্ত্রণকারীরই কৃতার্থ হওয়া উচিত।"—এই উক্তিটি কাহার? তিনি কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করেন? এই উক্তির সমর্থনে তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?

২। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) বন্ধনী মধ্যস্থিত শব্দগুলি হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

নিমন্ত্রণকারীরই — হওয়া উচিত। (যথার্থ, কৃতার্থ, সমর্থ)

এই বিষয়ে তিনি একজন — ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করেন।

(অশিষ্ট, সংশ্লিষ্ট, বিশিষ্ট)

(খ) নিম্নে কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ দেওয়া হইল, যে বিশেষণ পদটি উপযুক্ত সেইটি বিশেষ্য পদের পূর্বে বসাও ঃ

বৈষ্ণব, দুঃস্থ, সাধারণ, দিক, ভদ্রলোক, ধর্ম, পরিবার, মানুষ, অসাধারণ, বিশিষ্ট।

৩। সৃজনধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) অর্থ লিখ ঃ

মাতৃবিয়োগ, অপাঙ্‌ক্তেয়, পরিহাসচ্ছলে, ক্ষান্ত, বিব্রত।

(খ) নিজ বাক্যে সার্থক ব্যবহার কর ঃ

চম্পট দেওয়া, বর্তে যাওয়া, ভোজন-যজ্ঞ, বিন্দুমাত্র, দরিদ্রনারায়ণ, বিশাল হৃদয়।

(গ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ

অপরিচিত, আত্মীয়, বিরক্ত, অপাত্র, অস্পৃশ্য, অপাঙ্‌ক্তেয়, সক্রিয়।

৪। সৃষ্টিমূলক প্রশ্ন ঃ

ব্যাখ্যা লিখ ঃ (ক) চিত্তরঞ্জনের চরিত্রের এই দিকটি সহজেই ভিক্টর হিউগোর "লে মিজারেবল" কাহিনীর সেই বিখ্যাত বিশপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

(খ) যতই অর্থ-সামর্থ্য থাক, এ ধরনের বিশাল হৃদয় কোন্ দেশের ক'জন কর্মকর্তার মধ্যে দেখা যায়।

———



৪। পল্লী সমাজ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তারিণী মুখুয্যের ছোট ছেলে মরিয়াছে, পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল তাহাদের পুকুরঘাটের উপরই একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি কাপড়-চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকী আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়-চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন।

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেছেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত-অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, তারিণী দ্রুতপদে এই দিকে আসিতেছে। এক পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ীর লোককে পুকুরে নাবতে দাও নি?

বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাব বদ্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তার স্বভাব নয়; তাই আত্মসম্বরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা

উচ্ছন্ন যাই, তাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু আপনি যে সমস্ত পাড়াটা উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে। শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না ?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু ?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ীর কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত আমরা যাব কোথায় বলে দে ?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়-চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃতি করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এত বড় মুখ ? তুই বলিস্ মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে ? একলা আমার বাড়ীতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়ীতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই তখন মানুষ হন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভিসম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হ্যাঁ বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার ? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি ?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্চি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল, কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশ' বার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে। যা বলেচি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ মলে ওসব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) "তুমি নাকি আমার বাড়ীর লোককে পুকুরে নামতে দাওনি?"—এই প্রশ্ন কে কাহাকে করিয়াছিল? সত্যই কি পুকুরে নামিতে দেওয়া হয় নাই? ঘটনাটি বিবৃত কর।

(খ) "আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আপনি সমস্ত গ্রামটাকে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করছেন?"—এই উক্তি কাহার? কাহাকে এই কথা বলা হইয়াছে? তিনি কিভাবে সমস্ত গ্রামটা উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করছেন।

(গ) "শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে।"—এই কথা কাহার? কোন্ মন-গড়া শাস্ত্রের কথা বলা হইতেছে? প্রসঙ্গটি বুঝাইয়া দাও।

২। **সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ঃ—
ঘোমটা, উচ্ছন্ন, আত্মসম্বরণ, বিকৃতি, জবাব, সম্বল, মন-গড়া।

(খ) অর্থ লিখ ঃ

ক্রুদ্ধস্বরে, শুদ্ধভাবে, আত্মসম্বরণ, উদ্ধতভাবে, অভিসম্পাত, অভিপ্রায়, কলুষিত, রুষ্ট।

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—(বন্ধনী মধ্য হইতে শব্দ বাছিয়া লইয়া)

—ঘোষাল মহাশয় — হইয়া বলিলেন, এ তোমার — জিদ, বৃন্দাবন। শাস্ত্র মতে — করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই — বা — হয় না।

(হৃষ্ট, রুষ্ট, অসৎ, অকারণ, প্রতিষ্ঠা, অন্যায়, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, অসভ্য, দূষিত, অপবিত্র, ঘৃণিত, কলুষিত।)

(খ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ—(বন্ধনী মধ্য হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লও।)

মহাশয়, কলুষিত, ছোট, স্ত্রী, নিকটে, ভিতর, পরিষ্কৃত। (দূরে, পুরুষ, পবিত্র, অপরিষ্কৃত, বড়, দুরাশয়, বাহির)।

৪। সৃষ্টিধর্মী ঃ— (ব্যাখ্যা কর) ঃ

(ক) আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়।

(খ) কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেবো না।

(গ) দু পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

৫। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ—(মৌখিক)

(ক) "বৃন্দাবন বলিল—যা অন্যায় করেছেন তার ত আর উপায় নাই।"
কে কি অন্যায় করেছেন?

(খ) "আপনি এখন শোকে কাতর"
—কে কোন্ শোকে কাতর হইয়াছেন?

(গ) "কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না?…"
—কে কিসের মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না?

৬। "পল্লী সমাজ" প্রবন্ধটি পড়িয়া সেদিন বঙ্গদেশের পল্লী সমাজ কেমন ছিল—আলোচনা কর।



শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গদেশের কোন এক সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে একটি শিশুর জন্ম হয়। বাল্যনাম গদাধর। তাঁহার পিতা-মাতা অতি নিষ্ঠাবান্ প্রাচীনপন্থী লোক ছিলেন। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া মাতা সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতার কোলে এই শিশু জন্মগ্রহণ করেন। আর জন্ম হইতেই তাঁহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্মাবধিই তাঁহার পূর্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ হইত—কি কারণে তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমুদয় শক্তি নিয়োগ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে যথাসময়ে তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন।

ব্রাহ্মণ সন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। লেখাপড়ার কাজ ছাড়া ব্রাহ্মণের অন্য কাজে অধিকার নাই। যে বালকের কথা আমি বলিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিত ছিলেন। বালক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্প দিন পরে বালকের দৃঢ় ধারণা হইল যে, সকল লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব উন্নতি। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিলেন।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য দেখা দিল। বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার নিকটে এক স্থানে একটি মন্দিরে পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। এই মন্দিরের আনন্দময়ী জগন্মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা করিতে হইত।

তিনি শুনিয়াছিলেন, অতীতকালে অনেক বড় বড় সাধু ও মহাপুরুষ ভগবান লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। কিরূপে তিনি জগন্মাতাকে লাভ করিবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার এই ভাব বাড়িতে লাগিল। শেষে তিনি কিরূপে মায়ের দর্শন পাইব,—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে বা শুনিতে পারিতেন না। দিনের পর দিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন—মা, সত্যিই কি তুমি আছ, না এসব কল্পনা মাত্র? তাঁহার মনের এই প্রধান চিন্তাটি দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে, তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। নিয়মিত রূপে পূজা করা, সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা—এখন তাঁহার অসম্ভব হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি দেবতাকে ভোগ দিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখন কখন আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার কখন সব ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতি করিতেন। লোকমুখে ও শাস্ত্র মুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, যাহারা ব্যাকুলভাবে ভগবানকে চায়, তাহারাই তাঁহাকে পাইয়া থাকে। এক্ষণে ভগবানকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সেই প্রবল আগ্রহ দেখা দিল। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি পূজা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্তী পঞ্চবটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাব সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন—"কখন সূর্য উদিত হইল, কখন বা অস্ত গেল তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।" তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, আহার করিবার কথাও তাঁহার স্মরণ থাকিত না। এই সময় তাঁহার এক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্বক সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তিনি তাঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন। অজ্ঞাতসারে ঐ খাদ্য কতকটা উদরস্থ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, মা, তুই কি সত্যি আছিস্, তবে আমায় কেন অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস? আমি তোকে সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন?" এই ভাবে বালকের দিন-রাত্রি কাটিত। দিবাবসানে সন্ধ্যায় যখন মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "মা, আরও একদিন বৃথা চলে গেল, তবু তোমার দেখা পেলাম না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর একটা দিন চলে গেল, আমি সত্যকে জানতে পারলাম

না।" হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তিনি কখনও কখনও মাটিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্য হৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষ অবস্থায় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, মনে কর, একটা ঘরে একটি মোহরের থলি রহিয়াছে, আর তার পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর সেই চোরের নিদ্রা যাইবে? সে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই চিন্তার উদয় হইবে যে, কি করিয়া সে ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটি লইবে? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর যাহার এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছে যে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, একজন অবিনশ্বর অনন্ত আনন্দস্বরূপ আছেন, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্তের জন্যও কি সে এই চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।" এই বালকের হৃদয়ে এই উন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিলেন না, এমন কেহ ছিল না—সে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান দেয়, বরং সকলেই মনে করিত, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিল। তখন তাঁহার নানাবিধ অলৌকিক ও অদ্ভুত দর্শন হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া বালককে আকাঙ্ক্ষিত সত্যলাভের সাধনায় দীক্ষিত করিলেন।

পরে যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসিলাম, সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—"আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?" তখন গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ হইয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—"দেখেছি কিরে, কথা কয়েছি, এই তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি। তুই যদি দেখতে চাস তোকেও দেখাতে পারি।" ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, হৃদয়ের ব্যাকুলতাই তাঁহাকে মাতৃদর্শনে সমর্থ করিয়াছিল।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন:

(ক) "দেখেছি কিরে, কথা কয়েছি।"—এই উক্তিটি কাহার?

(খ) বালক গদাধর আহার সংস্থানের জন্য কোথায় কিভাবে কার্য গ্রহণ করিলেন?

(গ) গদাধর কিসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন? গদাধর তাঁহার ব্যাকুলতার কথা বলিতে গিয়া যে উদাহরণটি দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ কর।

(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ যে মাতৃদর্শন করিয়াছিলেন—তাহা লেখক কিভাবে প্রকাশ করিয়াছেন বুঝাইয়া দাও।

২। রচনাত্মক প্রশ্ন :

(ক) শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবন বর্ণনা কর।

৩। সৃজনাত্মক বা সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(ক) ব্যাখ্যা কর :

(১) এই ক্ষণস্থায়ী,……পারলাম না।

(২) ইহা হইতে স্পষ্টই……সমর্থ করিয়াছিল।

(৩) মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে।

(খ) অর্থ বল : নিষ্ঠাবান্, দরিদ্র, পূর্ববৃত্তান্ত, অসাধারণত্ব, উন্মত্ততা অবিশ্রান্ত, উন্মত্ত, আধ্যাত্মিক।

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) নিজ বাক্যে ব্যবহার কর :

প্রাচীন পন্থী, জন্মাবধি, অবশেষে, খুঁটিনাটি, অবিনশ্বর, অলৌকিক।

(খ) নিম্নে কতকগুলি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ দেওয়া হইল—কোন্‌টি বিশেষ্য ও কোন্‌টি বিশেষণ তাহার এক-একটি তালিকা প্রস্তুত কর :

দরিদ্র, উপবাস, সিদ্ধি, প্রেরিত, উন্নতি, পার্থিব, প্রবল, নিয়ম, দেহ, উদরস্থ, দীক্ষিত, ব্যাকুল, সপ্তাহ, প্রত্যহ, অসম্ভব, বৃত্তান্ত।

উদাহরণ :—	বিশেষ্য	বিশেষণ
	উপবাস, দেহ,	পার্থিব, দরিদ্র—ইত্যাদি

(গ) শূন্যস্থান পূরণ কর :

তিনি কলিকাতার নিকটে এক স্থানে এক মন্দিরের — নিযুক্ত হইলেন। এ — আনন্দময়ী জগন্মাতার একটি — ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও — তাঁহার — করিতে হইত।

(ঘ) বন্ধনীর মধ্য হইতে ঠিক উত্তরটি বাছিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্য নাম ছিল—। (দীপঙ্কর, গদাধর, বিদ্যাধর)।

(২) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন — ছিলেন। (পণ্ডিত, চিকিৎসক, কবি)।

(৩) পরে যে দিন — আসিলাম (নবদ্বীপে, পুরীধামে, দক্ষিণেশ্বরে)



ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ী ছুটছে তখন ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ি চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁসফাসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা অফিসে যেতেন কষে তামাক টেনে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ-ঘোমটাওয়ালা, কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌ম্যান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপধরানো অন্ধকারে। গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ, পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি, তার মানে লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোন মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর পুরুষের সামনে, কম করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্‌ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়ো মানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দরোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্‌লানো, দাড়ি চোম্‌ড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুম বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নীকে বন্ধ পাল্কিসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার

শোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত, কখনও বা কাঁচা-শাক-শুদ্ধ মুলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ হাঁ করে দুহাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনাবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলতো দুই সলতের একটা সেজ।

মাষ্টার-মশায় মিট্‌ মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্‌ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হয় মাষ্টার-মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নাই। সব ছেলের মধ্যে একলা মূর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কি জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠতো শিউরে। তখন ভূত-প্রেত ছিল গল্প-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তার ডালে এক পা আর অন্য পা-টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন, তখন চাকররা মনে করত, লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই; দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়া হওয়ায় আতঙ্ক এমন জাল ফেলেছিল যে টেবিলের নীচে পা রাখলে পা সুড়সুড় করে উঠত।

তখন জলের কল বসেনি। বেহারা বাঁকে করে কলসী করে মাঘ-ফাল্গুনে

গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল। নিচের তলায় সেই-সব স্যাঁতসেঁতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল, কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টোদিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ির ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন টেনে দেওয়া হত, ঝর্ ঝর্ কল কল করে ঝরনার মত জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টোদিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দায় রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতে সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) "তখন কাজের এত হাঁসফাসানি ছিল না।"—কখনকার কথা বলা হইতেছে? এই উক্তিটি যে সত্য, তাহা প্রমাণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দাও।

(খ) "দেখতে হতো যেন একটি গোরস্থান"—'গোরস্থান' শব্দের অর্থ কি? কাহাকে 'গোরস্থান' বলিয়া মনে হইত? কেনই বা মনে হইত?

(গ) "তাতে শিউ নন্দনের কিছু মুনাফা থাকতো।"—শিউ নন্দন কাহাকে বলা হইতেছে? তাহার কি ব্যাপারে মুনাফা হইত?

(ঘ) "ইষ্টদেবতার নাম শুনার জন্য এই ছিল তার ফন্দি?"—কাহার ফন্দি? ঐ নামটি কি? ফন্দিটি বুঝাইয়া বল।

(ঙ) "লোকটার ধর্মজ্ঞান একটু নাই।"—এই কথা কাহারা মনে করিত? কাহার ধর্মজ্ঞান নাই? কোন্ প্রসঙ্গে এই উক্তি করা হইয়াছে?

(চ) "ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলেরই বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে।"—এই ঠাকুরদা কাহার? এই ঠাকুরদার নাম কি? কি ভাবে পুকুরে জলের বরাদ্দ ছিল?

২। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) নিম্নের শব্দগুলির অর্থ লিখ ঃ
বখরা, মুনাফা, পালোয়ান্, সল্‌তে, আতঙ্ক, ঘটাটোপ, কোচ্‌ম্যান।

(খ) নীচের শব্দগুলি লইয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর ঃ
ফরাস্, পরপুরুষ, মুগুর, স্যাঁতসেঁতে, কসরৎ, বরাদ্দ, গল্পগুজব।

(গ) সাধুরূপ লিখ ঃ বিজলী, বিদ্যে, এঁদো, সুবিধে, ব্রহ্মদত্যি, হাঁস-ফাসানি।

(ঘ) টীকা লিখ ঃ মেম সাহেবি, দারোয়ান্‌জি, পালোয়ান, জমাদার, প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক।

৩। রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

ব্যাখ্যা লিখ ঃ (ক) প্রথমে উঠতো হাই……রগড়ানি।

(খ) "তখন ভূত-প্রেত ছিল…… আনাচে কানাচে।"

(গ) সেই ভূতুড়ে ছায়ায়……পায়ে লাগতো তাড়া।

৪। বস্তুধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) "পাশে পাশে চলতো পিতলের বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ান্‌জি।"
—ঐ দারোয়ান্‌জির কি কি কাজ ছিল?

(খ) রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় সহরে আলোর কি ব্যবস্থা ছিল?

(গ) "তখন জলের কল বসেনি।" তখন কি ভাবে জল সরবরাহ হইত?

(ঘ) "পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে।"
—কখন এইরূপ হইল? কি ভাবে এইরূপ হইল?



অপুদের গ্রামত্যাগ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৈশাখ মাসের প্রথমে হরিহর নিশ্চিন্দিপুর হইতে বাস উঠাইবার সব ঠিক করিয়া ফেলিল। যে জিনিষপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না, সেগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া নানা খুচরা দেনা শোধ করিয়া দিল। সেকালের কাঁঠাল কাঠের বড় তক্তপোষ, সিন্দুক, পিঁড়ি, ঘরে অনেকগুলি ছিল খবর পাইয়া ওপাড়া হইতে পর্যন্ত খরিদ্দার আসিয়া সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া গেল।

গ্রামের মুরুব্বিরা আসিয়া হরিহরকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিবার চেণ্টা করিতে লাগিলেন। নিশ্চিন্দিপুরে দুগ্ধ ও মৎস্য যে কত সস্তা বা কত অল্প খরচে এখানে সংসার চলে, সে বিষয়ের একটা তুলনামূলক তালিকাও মুখে মুখে দাখিল করিয়া দিলেন। কেবল রাজকৃষ্ণ (ভট্টাচার্য স্ত্রীর সাবিত্রীব্রত উপলক্ষে) নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন—বাপু, আছেই বা কি দেশে যে থাকতে বোল্‌বো—তা'ছাড়া এক জায়গায় কাদায় গুণ পুঁতে থাকাও কোন কাজের নয়, এ আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি—মন ছোট হয়ে থাকে, মনের বাড় বন্ধ হয়ে যায়। দেখি এবার তো ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রনাথটা সেরে আসবো, যদি ভগবান দিন দেন—

রাণী কথাটা শুনিয়া অপুদের বাড়ী আসিল। অপুকে বলিল—হ্যাঁরে অপু, তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলি যাবি? সত্যি?

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি, জিজ্ঞেস করো মাকে—

তবুও রাণী বিশ্বাস করে না। শেষে সর্বজয়ার মুখে সব শুনিয়া রাণী অবাক হইয়া গেল। অপুকে বাহিরের উঠানে ডাকিয়া বলিল, কবে যাবি রে?

সামনের বুধবারের পরের বুধবারে—

—আস্‌বিনে আর কখনো?

রাণীর চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, বলিল—তুই যে বলিস্‌ নিশ্চিন্দিপুর আমাদের বড় ভাল গাঁ, এমন নদী, এমন মাঠ কোথাও নেই—সে গাঁ ছেড়ে তুই যাবি কি ক'রে?

অপু বলিল—আমি কি করবো, আমি তো আর বলিনি যাবার কথা? বাবার সেখানে বাস করবার মন, এখানে আমাদের চলে না যে? আমার লেখা খাতাটা তোমাকে দিয়ে যাবো রাণুদি, বড় হলে হয়তো আবার দেখা হবে—

রাণী বলিল—আমার খাতাতে গল্পটাও শেষ করে দিলিনে, খাতায় নাম সইও করে দিলিনে, তুই বেশ ছেলে তা অপু? চোখের জল চাপিয়া রাণী দ্রুত-পদে বাটির বাহির হইয়া গেল। অপু বুঝিতে পারে না রাণুদি মিছামিছি কেন রাগ করে। সে কি নিজের ইচ্ছাতে দেশ ছাড়িয়া যাইতেছে?

স্নানের ঘাটে পটুর সঙ্গে অপুর কথা হইল। পটুও কথাটা জানিত না, অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা বেজায় দমিয়া গেল। ম্লানমুখে বলিল—তোর জন্য নিজে জলে নেমে কত কষ্টে শেওলা সরিয়ে ফুট কাট্‌লাম, একদিন মাছ ধরবিনে তাতে?

এবার রামনবমী, দোল, চড়কপুজো ও গোষ্ঠবিহার অল্পদিনের পরে পড়িল। প্রতি বৎসর এই সময় অপূর্ব, অসংযত আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে। সে ও তাহার দিদি এ সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিত। অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও তাহার কোন ত্রুটি হইল না।

চড়কের দিন গ্রামের আতুরীবুড়ি মারা গেল। নতুন যে মাঠটাতে আজকাল চড়কের মেলা বসে, তাহারই কাছে আতুরীবুড়ীর সেই দো-চালা ঘরখানা। অনেক লোক জড়ো হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখানে দেখিতে গেল। সেই যে একবার আতুরী ডাইনীর ভয়ে বাঁশবন ভাঙিয়া দৌড় দিয়াছিল তখন সে ছোট ছিল, এখন তাহার সে-কথা মনে হইলে হাসি পায়। আজ তাহার মনে হইল আতুরীবুড়ী ডাইনী নয়, কিছু নয়। গ্রামের একধারে লোকালয়ের বাহিরে একা থাকিত—গরীব, অসহায়, ছেলে ছিল না, মেয়ে ছিল না, কেহ দেখিবার ছিল না। থাকিলে কি আজ সারাদিন ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া থাকিত? সৎকারের লোক হয় না? পাঁচু জেলের ছেলে একটা হাঁড়ি বাহিরে আনিয়া ঢালিল—এক হাঁড়ি শুকনা আমচুর। ঝোড়ো আম কুড়াইয়া বুড়ি আম্‌সি আমচুর তৈয়ারী করিত ও তাহা হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া দিনপাত করিত। অপু তাহা

জানে, কারণ গত রথের মেলাতেও তাহাকে ডালা পাতিয়া আমসি বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে।

চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। আর বছরও চড়কের বাজারে দিদি নতুন পট কিনিয়া কত আনন্দ করিয়াছে। মনে আছে সেদিন সকালে দিদির সহিত তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। বৈকালে তাহার দিদি বলিল—পয়সা দেবো, অপু, একখানা সীতা-হরণের পট দেখিস্ যদি মেলায় পাস্? অপু প্রতিশোধ লইবার জন্য বলিল—যত সব পানসে পুতুপুতু পট, তাই তোর কিনতে হবে, আমি পারবো না, যা-কেন রাম-রাবণের যুদ্ধ একখানা কেন্ না? তাহার দিদি বলিল—তোর কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ—তোর যা কাণ্ড। কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হোল না? দিদির শিল্পানুভূতির শক্তির উপর অপুর কোন কালেই শ্রদ্ধা ছিল না।

তাহাদের বেড়ার গায়ে রাংচিতা ফুল লাল হইয়া ফুটিলে তাহার মুখ মনে পড়ে, পাখীর ডাকে, সদ্যফোটা ওড়কলমীর ফুলের দুলুনিতে—দিদির জন্য মন কেমন করে। মনে হয় যাহার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিলে খুশি হইত, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে—কতদূর! আর কখনো, কখনো সে এসব লইয়া খেলা করিতে আসিবে না!

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) "তোরা নাকি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি?"—এই প্রশ্ন কে কাহাকে করিয়াছে? কে কোন্ গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে। তাহারা যাইবার সময় কি কি জিনিষ বিক্রয় করিয়া গেল?

(খ) "অপুর মুখে সব শুনিয়া তাহার মনটা দমিয়া গেল?"—কাহার মন দমিয়া গেল? কি শুনিয়া তাহার মন দমিয়া গেল? অপুর বিদায়ে তাহার দুঃখের কারণ কি?

(গ) "সে-কথা মনে হইলেই হাসি পায়।"—কাহার হাসি পায়? কি কথা মনে হইলে হাসি পায়? হাসি পায় কেন?

(ঘ) "কেন ঠাকুর দেবতার পট বুঝি ভাল হলো না।"—এই উক্তি কাহার? কাহার প্রতি এই উক্তি? প্রসঙ্গটি আলোচনা কর।

২। সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(ক) অর্থ লিখ : ত্রুটি, আহার, নিদ্রা, পট, ডাইনী।

(খ) টীকা লিখ : সাবিত্রী, রামনবমী, চড়ক পূজা।

(গ) ব্যাখ্যা লিখ :

(১) একবার চন্দ্রনাথটা দেখে আসবো, যদি ভগবান দিন দেন।

(২) অপুর দিক হইতে অবশ্য এবারও কোন ত্রুটি হইল না।

(৩) চড়কটা যেন এবার কেমন ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল।

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :

প্রতি—এই সময় অপূর্ব,—আনন্দে অপুর বুক ভরিয়া তোলে।
সেও তাহার—এ সময় আহার নিদ্রা—করিত।

(খ) ঠিক উত্তর বাছিয়া উত্তর দাও :

(১) 'অপুর গ্রামত্যাগ' কাহিনীটি কোন্ বই হইতে লওয়া হইয়াছে?
(রামায়ণ, শকুন্তলা, পথের পাঁচালী)

(২) "অপুদের গ্রামত্যাগ" কাহিনীটি কাহার লেখা?
কাশীরামদাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণবন্দ্যোপাধ্যায়।

(৩) রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কোন্ ব্রত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিলেন?
(রাধাষ্টমী, সাবিত্রীব্রত, রামনবমী ব্রত)।

৪। বস্তুমুখী প্রশ্ন :

(ক) আতুরী বুড়ির পরিচয় দাও।

(খ) অপুর গ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় রাণীর দুঃখের কি পরিচয় পাওয়া যায়?

(গ) আতুরী বুড়ি কি করিয়া দিনপাত করিত?

(ঘ) এবার চড়কের মেলা ফাঁকা ঠেকিল কেন?

(ঙ) পানুসে পুতুপুতু পট কাহাকে বলা হইতেছে?

(চ) আতুরী বুড়ির সৎকারে বিলম্ব হইল কেন?

৫। চিন্তামূলক প্রশ্ন :

(ক) নিজ বাক্যে যথাযোগ্য অর্থে ব্যবহার কর :

অশ্রুপূর্ণ, ম্লানমুখে, লোকালয়, প্রতিশোধ, অসহায়, বেজায়, সৎকার।

(খ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

বিক্রয়, সেকাল, দ্রুত, আনন্দ, গরীব, দূর।



বৃষ্টি বিন্দুর ঐক্য

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু। এক একজনে যূথিকা-কলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা সে-ই ক্ষুদ্র, সে-ই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই সে-ই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে। চল সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্বুদে অর্বুদে এই শুষ্ক পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্য-হৃদয় ভরাইয়া তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্। বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এই বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে জলে স্থলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম অট্টালিকা স্রোত-মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি! বায়ু! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না,—ঐক্যই বল,—নইলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব, মনুষ্য বাঁচিবে। তৃণ, লতা—বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু-পক্ষী,

কীট-পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি বিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

এস সব নীল কাদম্বিনী। গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন কর, আমরা নামি। আমরা ডেকে ডেকে, হেসে হেসে, নেচে নেচে ভূতলে নামি। তুমি বৃত্রমর্মভেদী বজ্র, তুমিও ডাক না,—এ উৎসবে তোমার মত বাজনা কে? তুমিও ভূতলে পড়িবে? পড়, কিন্তু কেবল গর্বোন্নতের মস্তকের উপর পড়িও।

এই ক্ষুদ্র পরোপকারী শস্য-মধ্যে পড়িও না—আমরা তাহাদের বাঁচাইতে যাইতেছি। ভাঙ্গ ত এই পর্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গ। ক্ষুদ্রকে কিছু বলিও না—আমরা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।

দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ। গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে—ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষী চষিতেছে ছেলে ভিজিতেছে; কেবল বেনেবউ আমসি ও আমসত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা। দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গরস জানি; মল্লিকার মধু ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরানী কাপড় শুকাইতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। আমরা কি কম!

তা যাক—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্বতকন্দর, দেশপ্রদেশ ধুইয়া নূতন দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণ সূত্রকায়া তটিনীকে কুলপ্লাবিনী দেশ-মজ্জিনী অনন্তদেহধারিণী জলরাক্ষসী করিব। কোনও দেশের মানুষ রাখিব, কোনও দেশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে?

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) "দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না।"—এই কথাটি কে কাহাদের বলিতেছে? একা নামিতে নিষেধ করিতেছে কেন?

(খ) "বায়ু তো আমাদের গোলাম।"—এই উক্তি কাহার? 'গোলাম' শব্দের অর্থ কি? বায়ুকে 'গোলাম' বলা হইতেছে কেন?

(গ) 'ক্ষুদ্রের জন্য আমাদের বড় ব্যথা।"—এই উক্তি কাহাদের? কাহাদের প্রতি এই উক্তি? ক্ষুদ্রের জন্য উহাদের বড় ব্যথা কেন? কোন্ ক্ষুদ্রের প্রতি ব্যথা দেখাইবার জন্য এই কথা বলা হইয়াছে?

(ঘ) রামী চাকরানী কে? এই প্রবন্ধের সহিত তাহার কি সম্পর্ক। বক্তা কিভাবে রামী চাকরানীর কাজ বাড়াইয়া রাখে?

২। চিন্তামূলক প্রশ্ন :—

(ক) বৃষ্টি বিন্দু পৃথিবীতে নামিয়া কি কি উপকার করে? সেই উপকার-গুলির কথাগুলি উল্লেখ করিয়া বৃষ্টি বিন্দু যে উক্তিগুলি করিয়াছে—সেইগুলি এই প্রবন্ধ হইতে খুঁজিয়া বাহির কর।

(খ) লেখকের রসবোধ প্রকাশ পাইতেছে এমন দুইটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর!

৩। আলোচনামুখী প্রশ্ন :

বৃষ্টি বিন্দুর মুখ দিয়া লেখক আমাদের কি বলিতে চাহিয়াছেন?

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(১) ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) দেখ, যে একা সে-ই ক্ষুদ্র, সে-ই সামান্য।

(খ) আমাদের বর্ষা-যুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র।

(গ) ঐক্যই বল, নহিলে আমরা কেহ নই।

(ঘ) আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

(২) অর্থ বল : অবুর্দ, মহাকল্লোল, ভীমবাদ্য, দেশান্তর, তৃণ, গর্বোন্নত, বিশীর্ণ, কূলপ্লাবিনী, দেশমণ্ডিনী, সূত্র, কায়া, তটিনী।

(৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর : নির্ঝর, শূন্যহৃদয়, দেশান্তরে, গর্বোন্নত, রঙ্গরস, ফলার, জল-রাক্ষসী।

(৪) সপ্রসঙ্গ টীকা লিখ :—

বৃত্র, মর্মভেদী, পরোপকারী, শস্য, বেনে বউ, মর পাপিষ্ঠা, ফলার।

৫। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :

আমাদের এই বর্ষা-যুদ্ধে বায়ু — মাত্র। তাহার — পাইলে জলে — এক করি। তাহার চড়িয়া — দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি?

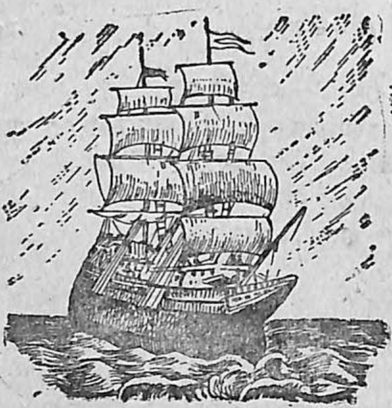
(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ প্রদত্ত শব্দসমূহ হইতে বাছিয়া লিখ :

ভঙ্গি, মানুষ, প্রকাশ, উন্নত, বাহির, শুষ্ক, ক্ষুদ্র।

শব্দ তালিকা :

অবনত, পণ্ড, নড়, আদ্র, বৃহৎ, গোপন, পতন, বক্র, ভিতর।

(গ) গিরি, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, শৈল, অচল, নদী, নগ।—এই শব্দগুলির মধ্যে ও তটিনী এবং পর্বতের দুইটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ।



অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের অভিযান

আরতি দাস

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের মধ্যে ছোট মহাদেশটির নাম অষ্ট্রেলিয়া—একথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এই মহাদেশটির আবিষ্কার হয়েছিল কি ভাবে, সে বিষয়ে অনেকেই কিন্তু জানেন না। আজ সেই কথাই এখানে বলছি।

যতদূর জানা যায়, অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার হয় ১৬০৬ সালে। আবিষ্কারক হলেন হল্যাণ্ডের একজন অধিবাসী,—নাম উইলিয়ম জন্সজুন। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের কাছে যে দ্বীপটি তাসমানিয়া নামে পরিচিত, সেটিও প্রথম আবিষ্কার করেন একজন হল্যাণ্ডবাসী—নাম আবেল তাসমান। তবে এঁরা শুধু আবিষ্কার করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন, মহাদেশটি সম্বন্ধে বিস্তৃত জানবার আগ্রহ তাদের ছিল না, অথবা বোধহয় জানবার ব্যবস্থা তাঁরা করে উঠতে পারেন নি।

এই বিষয়ে প্রথম চেষ্টা হয় ১৭৭০ সালে। এর পথপ্রদর্শক হচ্ছেন একজন দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক—নাম জেমস কুক এবং আর একজন বিজ্ঞানী—নাম সার জোসেফ ব্যাঙ্কস্। এই মহাদেশটির বিচিত্র পুষ্পসম্ভার দেখে এঁরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর নাম রাখেন Botany Bay বা উদ্ভিদসাগর। এখানেই সর্বপ্রথম একটি বিচিত্র জীব তাঁদের চোখে পড়ে—সেটি দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মত, কিন্তু গ্রেহাউণ্ড কুকুরের মত তার বিশাল দেহ। দু'পায়ে হাঁটে অথচ বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে বেড়ায়। এই জন্তুটিই হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত ক্যাঙ্গারু যা একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ারই নিজস্ব সম্পদ।

ক্রমে এই মহাদেশে সভ্য জাতির পদার্পণ সুরু হয় এবং তাঁদের বসতি বিস্তার চলতে থাকে। এরা প্রথমে উপকূল অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলেই

বসতি বিস্তার করতে থাকে। মহাদেশের অন্তর্ভাগ সম্বন্ধে জানবার জন্য আগ্রহ বা কৌতূহল তাদের ছিল না, উপরন্তু ছিল এক বিশেষ ধরনের ভীতি। কারণ তখনকার আদিবাসীরা প্রস্তর যুগের মানুষের মত অনুন্নত, বিদেশীদের নির্বিচারে হত্যা করতে এরা কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। আরেকটি প্রধান বাধা ছিল—জল। দেশের অভ্যন্তরে সভ্য মানুষের উপযোগী পানীয় জলের অভাবই ছিল প্রধান অন্তরায়। তাই অষ্ট্রেলিয়ার বিচিত্র ভৌগোলিক তথ্য জানবার চেষ্টায় প্রথম কাজই হলো নদী আবিষ্কার করা। এই চেষ্টা অনেকেই সুরু করেছিলেন। কিন্তু প্রথমে যিনি সাফল্যলাভ করেন তাঁর নাম হলো স্টার্ট। তিনি ১৮২৮-৩০ সালে অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্দেশে সর্বপ্রথম দুটি নদী আবিষ্কার করেন এবং তাঁদের নাম দেন ডার্লিং ও মুরে। আর এই দুটিকে সংযোগ করেছে যে নদী, তার নাম দেন মুরুম্বীজ। এর পরে উল্লেখযোগ্য নাম ডাঃ লিচার্ড। অজানা মহাদেশটিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ সালে একদিন তিনি অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করেন। তারপর দীর্ঘদিন তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। পনেরো মাস পরে অর্ধমৃত ও অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় তিনি এসে পেঁছিলেন মহাদেশের উত্তর উপকূলে, কার্পেণ্টারিয়া উপসাগরের কাছে, যেখানে জন্সজুনের পর আর কোন শ্বেত মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। ১৮৪৮ সালে তিনি আবার অভ্যন্তরে অভিযান সুরু করেন, কিন্তু তারপর আর কোন খবর পাওয়া যায় নি।

এবার একটি সংঘবদ্ধ অভিযান শুরু হোল। ১৮৬০ সালে ভিক্টোরিয়া ঔপনিবেশিকরা একটি অভিযানের সংকল্প করলেন, যাতে সমগ্র মহাদেশটির দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত অনুসন্ধান চালানো যায়। এই অভিযানের নেতা ঠিক হলেন রবার্ট বার্ক নামে একজন পুলিশকর্মচারীএবং উইলিয়ম নামে একজন আবহবিদ। ডার্লিং নদীর ধারে মোনাস্তে নামে একটি জায়গায় তাঁরা প্রথম ঘাঁটি স্থাপন করেন। এখান থেকে তাঁরা যাত্রা শুরু করেন উত্তর দিকে। সাতজন সঙ্গী নিয়ে পাঁচটি ঘোড়া ও ষোলটি উটের পিঠে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস চাপিয়ে বার্ক যাত্রা শুরু করলেন উত্তর দিকে। ঘাঁটিতে পাহারায় রেখে গেলেন রাইটকে এবং ঠিক হলো উত্তরে একটি সুবিধামত জায়গা পেয়ে গেলে রাইটকে খবর দিলে তিনি ঘাঁটি উঠিয়ে নতুন জায়গায় এসে দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। যাই হোক, বার্ক সুরুতেই একটি সফলতার মুখ দেখলেন। উত্তর দিকে বেশ কিছুদূর গিয়ে বার্ক একটি

পরিষ্কার জলাশয় দেখতে পেলেন, পাশেই একটি বিশাল তৃণভূমি। জায়গাটির নাম কুপার্স ক্রীক। বার্ক দলবল নিয়ে এখানেই এসে বিশ্রাম নিলেন এবং রাইটকে সংবাদ দিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাইট সে আইন মান্য না করে নিজের ঘাঁটিতে থেকে গেলেন। বার্ক তখন উইল্‌স্‌ ও আরও দুজন সঙ্গীকে নিয়ে আরও উত্তরে যাত্রা করলেন। বাকি সকলে দ্বিতীয় ঘাঁটিতে থেকে গেলেন। সঙ্গে সাজসরঞ্জাম নিয়ে গেলেন একটি ঘোড়া ও বারোটি উট। অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁরা অভিযান শুরু করলেন। এইভাবে ম্যাক্‌কীনলে পর্বতমালা পার হয়ে তাঁরা এসে পৌঁছলেন ফ্লান্ডার নদীর কাছে। নানা জনপদ ও বনপথ পার হয়ে এই নদীটি মহাদেশের উত্তর প্রান্তে কার্পেণ্টারিয়া উপসাগরে এসে পড়েছে। এইবার তাঁদের উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হলো। উত্তর উপকূলে সহজেই পৌঁছে গেলেন তাঁরা।

এবার ফেরবার পালা। তাঁরা পিছনে ফেরা শুরু করলেন ১৮৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু গ্রে নামক তাঁদের এক সঙ্গী অসুস্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। বাকি সকলে অর্থাৎ বার্ক উইলস্‌ কিং মৃত অবস্থায় কুপার্স ক্রীকের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু এখানেও দুর্ভাগ্য তাঁদের প্রতারণা করলো। এই ঘাঁটিতে তাঁরা যাঁকে রেখে গিয়াছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে অগ্রগামীদের কাছ থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে তিনি মনে করলেন তাঁরা নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছেন অথবা মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ তাঁদের খোঁজ নেবার কোন ব্যবস্থাই করলেন না। ক্ষুধার্ত অভিযাত্রীর সফল অভিযানের শেষে ঘাঁটিতে ফিরে এসে দেখেন ঘাঁটি জনশূন্য। চূড়ান্ত হতাশায় তাঁরা ভেঙে পড়লেন। প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় ক্লান্ত, দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁরা ইতস্ততঃ খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু উপযুক্ত খাবারও তাঁদের চোখে পড়লো না, ফলে অনাহারে মারা গেলেন তাঁদের মধ্যে দু-জন—বার্ক ও উইল্‌স্‌ কি কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে সাহায্যের আশায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে তাঁদের কোন সংবাদ এসে পৌঁছায় না। তাই দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এই অভিযানের উদ্যোক্তা তাঁদের খোঁজ নেবার জন্য দিকে দিকে লোক পাঠালেন। তাদের একটি দল খোঁজ করে অবশেষে মৃতপ্রায় অবস্থায় কিং-এর দেখা পেলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে তাঁকে সুস্থ করে তোলা হলো। তারপর তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে কুর্পাস ক্রীকের কাছে গিয়ে তাঁরা বার্ক আর উইলস্‌-এর

মৃতদেহ দেখতে পেলেন। সেই অমর অভিযাত্রী দু-জনের মৃতদেহ তাঁরা বহন করে নিয়ে এলেন মেলবোর্ণে এবং পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে সেখানে তাঁদের সমাহিত করলেন। সমাধি দুটি ঘিরে তৈরী হলো একটি মনুমেন্ট। বিশ্বের অভিযাত্রীবৃন্দ আজও সেখানে গেলে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

এই অভিযানের ফলে অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পথ সুগম হলো। আর তার ফলেই পরবর্তীকালে আরও অনেক অভিযাত্রীদল অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে গিয়ে ক্রমশঃ এই মহাদেশটির ভৌগোলিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্ত তথ্যই সভ্য সমাজের গোচরে আনয়ন করেন।

অনুশীলনী

১। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) কাহাদের দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয়?

(খ) কোন্ জীব অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব সম্পদ?

(গ) অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের কি কি অন্তরায় ছিল?

(ঘ) কবে কাহারা একটি সংঘবদ্ধ অভিযান শুরু করিয়াছিল?

২। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) বার্ক যাত্রার শুরুতেই সফলতার মুখ দেখলেন। বার্ক কিরূপ মুখ দেখলেন?

(খ) এই অভিযানে কারা যোগ দিয়েছিলেন? শেষ পর্যন্ত কে বা কারা স্বদেশে ফিরতে পেরেছিলেন? ফিরবার পথে তাদের কিরূপ অবস্থা হয়েছিল?

(গ) এই অভিযানের উদ্যোক্তারা অভিযাত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছিলেন? মৃত অভিযাত্রীদের স্মরণার্থে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

এই অভিযানের ফলে পরবর্তীকালে অভিযাত্রীদিগের কি উপকার হয়েছে?

৩। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর ঃ প্রচণ্ড, ক্ষান্ত, নিজস্ব, সঙ্ঘবদ্ধ, অজ্ঞাত, অভিযান।

(খ) অর্থ লিখ ঃ বিশ্ববিখ্যাত, নির্বিচারে, দুর্ভাগ্য, অভ্যন্তরে, অনুসন্ধান, চূড়ান্ত, জনশূন্য।

(গ) এক একটি শব্দে প্রকাশ কর ঃ

মরার মত, আবহাওয়া সম্বন্ধে যিনি জানেন, ভেতরের অংশ, উল্লেখ করিবার উপযুক্ত, খুব বেশী সাহস যার।

৪। সৃষ্টিধর্মী প্রশ্ন ঃ

ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে রাইট্ সে আইন মান্য না করে নিজের ঘাঁটিতে থেকে গেলেন।

(খ) বিশ্বের অভিযাত্রীবৃন্দ সেখানে গেলে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন।

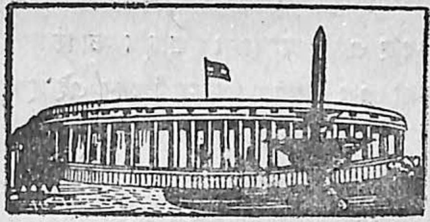
৫। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া লইয়া শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

(ক) অষ্ট্রেলিয়ার নিজস্ব সম্পদ —। (বাঘ, হরিণ, ক্যাঙ্গারু, ভালুক)

(খ) বার্ক — পর্বতমালা পার হয়ে ফ্লাণ্ডার নদীর কাছে এসে পৌঁছলেন। (আণ্ডিজ্, আশ্বাস্‌স্যাক, কীনলে।)

(গ) এই অমর অভিযাত্রী দুজনের মৃতদেহ তাঁরা বহন করে নিয়ে এলেন —। (প্যারিস্, মেলবোর্ণ, স্টকহলম্।)



রাজধানীর ডাকে

শ্রীজ্ঞানদাকান্ত মিশ্র

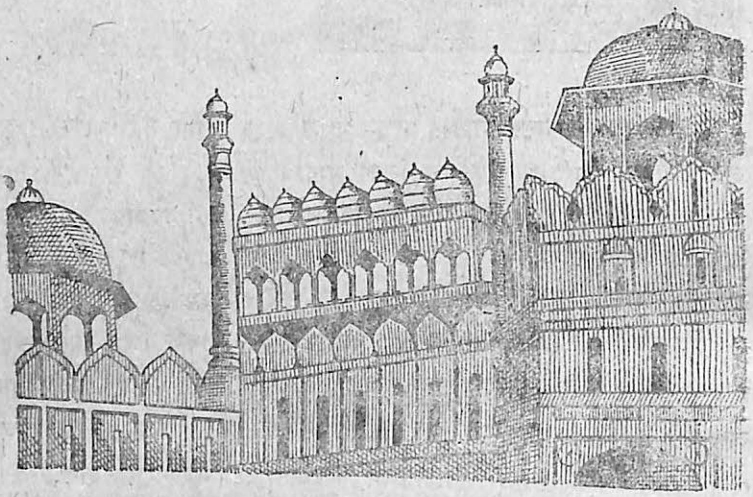
ঊনিশ শত তিয়াত্তর সালের মার্চ মাসে হঠাৎ এলো রাজধানীর ডাক। জাতীয় শিক্ষা-পর্ষদের আমন্ত্রণে দিল্লী যাত্রা। দীঘা থেকে খড়্গপুর বাসে এবং খড়্গপুর থেকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিলাম ন'ই মার্চ বিকালে। স্টেশনে এলেন কয়েকজন আত্মীয় ও ছাত্র দেখা করতে। দিল্লী এক্সপ্রেসে বসলাম রাত্রি ন'টায়। ব্যবস্থা ভাল। আলো, পাখা, জল, সবই রয়েছে, রিজার্ভ করা সীট্।

প্রকৃতির শোভা দেখার একটা লোভ থাকলেও আশা সফল হলো না গভীর অন্ধকারে। গাড়ীর জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। দেখলাম অন্ধকারে একটা অখণ্ড রূপ। মাঝে মাঝে স্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে দেখা গেল অগণ্য যাত্রীর আনাগোনা। শোনা গেল ফেরিওয়ালাদের নানা সুরে হাঁক-ডাক। ক্রমে ক্রমে বর্ধমান, আসানসোল প্রভৃতি ছাড়িয়ে গাড়ী চললো পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে।

পরদিন সকালে গাড়ী চলেছে বিহারের মধ্য দিয়ে। রেললাইন থেকে খানিক দূরে দেখা গেল অনেক আম-বাগান। গাছগুলি দেখতে এক একটি দেউলের মত। মুকুলের ভারে শাখাগুলি অবনত। দু'দিকে সেচের সাহায্যে গমের চাষ, যতদূর চোখ যায় মাঠগুলি সবুজে ভরা। পাটনা থেকে যতই এগুতে লাগলাম দেখলাম শুধু মাঠ আর মাঠ, কেবল সবুজের মেলা। জনবসতি বিরল। এদেশের মতো চাষের জমি ভরাট করে থাকবার ঘর তোলার ব্যস্ততা নাই সেখানে। দেখে মনে হলো ওখানকার আদিবাসীরা সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। কিন্তু রেললাইনের পাশে পাশে শত শত জীর্ণ কুটীর, ষ্টেশনে এবং ট্রেনের কামরায় ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে অসংখ্য শীর্ণকায় ভিক্ষুকের আনাগোনা সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের পরিচয় দেয়।

মোগলসরাই ষ্টেশনে একটি দৃশ্য দেখলাম। একটি গাছের তলায় এক কৌপীন পরিহিত যুবক সন্ন্যাসী। দেহ তার নগ্ন। শীর্ষাসন করছেন তিনি। তাঁর পাশে একটি কমণ্ডুল, এছাড়া তার সম্বল একখানি ভাঁজ করা কম্বল।

যতক্ষণ গাড়ী ষ্টেশনে ছিল, তাকে দেখছি একই অবস্থায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে মুনি ঋষিরা কিরূপ ত্যাগী, সংযমী এবং সংসারে অনাসক্ত ছিলেন এই দৃশ্য তারই একটি নমুনা।



লালকেল্লা

এরপর শুরু হলো পাহাড়ের পর পাহাড়। রেললাইনের দক্ষিণে প্রচুর গিরি-শ্রেণী, উত্তরে বহু একক পাহাড়। এই পাহাড়গুলির উপর কোথাও মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশূল থেকে বুঝা যায় শিবের মন্দির। সারা উত্তরপ্রদেশটিতে যেন কাশীর বিশ্বেশ্বরের ষোল আনি রাজ্য।

দিল্লী পর্যন্ত বক্সার, চুনার প্রভৃতি অনেকগুলি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। সেই জায়গাগুলিতে গাড়ী পৌঁছলে মনে পড়ে কত রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী।

প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা অবিরাম ছুটে তৃতীয় দিন বেলা ন'টায় গাড়ীখানি পৌঁছেছিল অতীতের রাজধানী দিল্লীতে। ট্যাক্সি চড়ে যেতে হলো নয়া ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে। স্নান, আহার ও বিশ্রামের পর দিল্লী দর্শনের পালা। রাজধানীর রাজপথগুলি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। যানবাহনের বাহুল্যও কম। যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক পুলিশ পথের ভিড় বাড়ায়নি। তার বদলে রয়েছে আলোর দিশারি। রাস্তার পাশে পাশে রয়েছে সরু সরু ফুলের বাগান। রাজধানীতে দেখলাম না একটিও ভিক্ষুক। এর থেকে বিদেশী পর্যটকেরা হয়তো মনে করছেন এ দেশে ভিক্ষুক নাই।

শিক্ষা-পর্ষদের তত্ত্বাবধানে আমাদের শিক্ষাচর্চা চললো তিন দিন ধরে। তারপর সরকারী ব্যয়ে ও তত্ত্বাবধানে আমাদের দেখানো হলো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি শিক্ষা-পর্ষদে আগত শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে।

দিল্লী মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত রাষ্ট্রপতি-ভবন একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ। এই সৌধটির মধ্যস্থলে একটি বিরাট হল। লাল ও সাদা বেলেপাথর এবং বিভিন্ন রকমের মার্বেল পাথর দিয়ে এই প্রাসাদ নির্মিত। তিন শ' ত্রিশ একর ভূমির উপর এই ভবনটি প্রতিষ্ঠিত। এর বিস্তৃতি দেড় মাইল। এর মধ্যে আছে তিনশ'র বেশী কক্ষ, প্রচুর স্তম্ভ, ফোয়ারা ও উপরের ঘরে ওঠার লিফ্‌ট। এর আর একটি বৈশিষ্ট্য মোগল-বাগ। দর্শকদের মনোহরণকারী এই উদ্যানের শোভা-সৌন্দর্য।

এর পর দেখানো হলো পার্লামেণ্ট ভবন এবং আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান। মহানগরীতে রয়েছে কয়েকটি তোরণ। এদের মধ্যে কিংসরোডের প্রান্তে অবস্থিত ইণ্ডিয়া গেট্ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত ভারতীয় যোদ্ধাদের স্মৃতি বহন করে। লৌহস্তম্ভ, পৃথিবরাজ মন্দির, কুতুবমিনার, লালকেল্লা, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত স্থানগুলি এতদিন কেবল বইতে পড়া ছিল। সেগুলি দেখে বাস্তব জ্ঞান হলো।

লালকেল্লা সম্রাট শাহজাহানের রাজপ্রাসাদ—বিপুল ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ রাজ-পরিবারের বিলাসক্ষেত্র, সম্রাটের আড়ম্বরপ্রিয়তার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথাও সত্য যে সেই আড়ম্বরের খোরাক জুগিয়েছিল ভারতবর্ষের দরিদ্র প্রজা। এর পর দেখলাম যন্তর মন্তর বা মান মন্দির। এটি নির্মাণ করেছিলেন আজ থেকে আড়াইশ' বছর আগে জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ। এখানকার সূর্য-ঘড়ি বিশেষ দর্শনীয়।

এখানেই কেন্দ্রীয় শিক্ষা-পর্ষদের তত্ত্বাবধানে দিল্লী দর্শন শেষ হলো। কিন্তু সুদূর দিল্লী এসে এখানেই ছেদ টানা গেল না। পরদিন একখানি টাঙ্গা ভাড়া করা হলো সারা দিনের জন্য। রাজঘাট, শান্তিবন, বিজয়ঘাট, বিড়লা মন্দির, জুমা মসজিদ দেখে এলাম। রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি। বেষ্টনী ঘেরা একটি মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাধি। নিকটে গান্ধীজির স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতি মন্দির। রাজঘাট এখন একটি জাতীয় তীর্থ-

ক্ষেত্র। শান্তিবনে স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু এবং বিজয়ঘাটে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। রাজঘাট থেকে শান্তিবন প্রায় এক ফার্লং, শান্তিবন থেকে বিজয়ঘাট প্রায় তিন মাইল। এই তিনটি স্থানই যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম এঁদের স্মৃতির প্রতি। বিড়লা মন্দিরের মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণের, ডাইনে শিবের এবং বামে শিবের, আর এক পাশে বুদ্ধদেবের মন্দির। দেখলাম সকল শ্রেণীর হিন্দু, এমনকি বিদেশীরাও এই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারেন। মন্দিরটি দেব-দেবীর স্তোত্র ও গীতা পাঠে এবং নামকীর্তনে সর্বদা মুখর হয়ে আছে। মন্দিরের দেওয়াল গাত্রে ভাগবত ও রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনীকে চিত্রে রূপ দেওয়া হয়েছে। মন্দিরটি নির্মিত হয় আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে। নির্মাণ করেন বলদেও দাস বিড়লা। মহাত্মা গান্ধী এই মন্দিরের উদ্বোধন করেছিলেন।

দিল্লী দর্শনের শেষ সূচী জুমা মসজিদ। সম্ভবত এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ। এটিও সম্রাট শাহজাহানের অন্যতম কীর্তি। ওর গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ আছে তা থেকে জানা গেল এটি তৈরী করতে পাঁচ হাজার শ্রমিক ও মিস্ত্রীর পাঁচ বছর লেগেছিল। মিস্ত্রীদের মজুরী দুই পয়সা, সাধারণ শ্রমিকের এক পয়সা। মোট ব্যয় হয়েছিল দশ লক্ষ টাকা। দু'মাইল দূর থেকে দেখা যায় এই মসজিদ। তিনটি প্রবেশ-পথের পূর্ব দিকেরটি সব থেকে চওড়া, ও-টি সম্রাটের প্রবেশ পথ। এর মধ্যে একটি জলাশয়, দুদিকে দুটি সুউচ্চ মিনার। পূর্বোক্ত লিপি থেকে আরও জানা যায়—১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই সম্রাট শাহ্‌জাহান এই মসজিদে প্রথম প্রার্থনা করেন।

ভারতের ইতিহাসে দিল্লীর বিশিষ্ট স্থান। দিল্লীর দর্শনীয় স্থানের অভাব নাই। সব অজানাকে জানা হলো না। সুদূর বঙ্গের ঘরের টানে ফিরতে হলো।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) লেখক দিল্লীর পথে যে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিলেন সেগুলি বর্ণনা কর।

(খ) মোগলসরাই স্টেশনে দেখা দৃশ্যটির বর্ণনা দাও।

(গ) নূতন দিল্লীর রাজপথগুলি কেমন ?

(ঘ) দিল্লী মহানগরীতে সরকারী ব্যবস্থায় যে স্থানগুলি দেখানো হয়েছিল তাদের নাম কর।

(ঙ) নিম্নলিখিত স্থানগুলির পরিচয় দাও ঃ
রাজঘাট, শান্তিবন, বিজয়ঘাট, যন্তর-মন্তর।

(চ) 'রাজধানীর ডাকে' প্রবন্ধ থেকে সম্রাট শাহজাহানের কীর্তিগুলির উল্লেখ কর। এই কীর্তিগুলি কিসের পরিচয় দেয়?

২। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) হাওড়া থেকে দিল্লীর মধ্যে কয়েকটি রেলস্টেশনের নাম কর।

(খ) লেখকের হাওড়া থেকে দিল্লী যেতে কত সময় লেগেছিল?

(গ) বিড়লা মন্দির কার নির্মাণ? এর উদ্বোধন কে করেছিলেন?

(ঘ) বিড়লা মন্দিরে কোন্ কোন্ দেবতার বিগ্রহ আছে?

(ঙ) বিড়লা মন্দির গাত্রে কিসের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে?

(চ) যন্তর-মন্তর কথাটির অর্থ কি? উহা কাহার দ্বারা কতকাল আগে নির্মিত হয়?

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ
যেটি ঠিক তার নীচে দাগ দাও বা সেটি লিখ ঃ

(ক) লেখক মোগল সরাইতে কাকে শীর্ষাসন করতে দেখলেন?
(ফকির, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ)

(খ) জুম্মা মসজিদ কার কীর্তি? (আকবর, শিবাজী, শাহজাহান)

(গ) রাজঘাটে কার সমাধি? (জওহরলাল, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু)

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর ঃ
আনাগোনা, ব্যস্ততা, নমুনা, ষোল-আনি, দিশারী।

(খ) অর্থ লিখ ঃ
শীর্ণকায়, অনাসক্ত, উত্থান-পতন, প্রাসাদ, সমৃদ্ধ।

(গ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
মন্দিরের চূড়ায় — থেকে বুঝা যায় — মন্দির। সারা উত্তর-প্রদেশটিতে যেমন — বিশ্বেশ্বরের — রাজ্য।

৫। সৃষ্টিধর্মী প্রশ্ন ঃ
ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতবর্ষে মুনিঋষিরা……তারই একটি নমুনা।

(খ) কিছু এ কথাও সত্য যে……দরিদ্র প্রজা।

———



গাছের জন্ম ও মৃত্যু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আমরা যেরূপ আহার করি, গাছও সেইরূপ আহার করে। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খাইতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নাই, তাহারা কেবল দুধ খায়। গাছেরও দাঁত নাই, সুতরাং তাহারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিতে পারে। মূল দ্বারা মাটি হইতে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢালিলে চিনি গলিয়া যায়। মাটিতে জল ঢালিলে মাটির ভিতরের অনেক জিনিষ গলিয়া যায়। গাছ সেই সব জিনিষ আহার করে। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের আহার বন্ধ হইয়া যায় ও গাছ মরিয়া যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়া অতি ক্ষুদ্র পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এই সব নল দ্বারা মাটি হইতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এ ছাড়া গাছের পাতা বাতাস হইতে আহার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়া এই সব মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করিবার আবশ্যক হয় না তখন ঠোঁট দুইটি বুজিয়া যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জমিতে থাকে তবে সকল জন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভাবিয়া দেখ। যাহা জন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া

দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করিয়া গাছকে বাড়াইতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করিয়া একটু আলো পায়। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ তবে দেখিবে, সমস্ত ডালগুলি অন্ধকার দিক্ ছাড়িয়া আলোর দিকে যাইতেছে। বনে যাইয়া দেখিবে, গাছগুলি তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া, কে আগে আলোক পাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতেছে। লতাগুলি ছায়াতে পড়িয়া থাকিলে আলোর অভাবে মরিয়া যাইবে; এইজন্য তাহারা গাছ জড়াইয়া ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে।

এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্যের তেজ। গাছও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তাহা এক প্রকারে জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমরাও আলো আহার করিয়াই বাঁচিয়া আছি।

গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! বোধ হয়, গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আনে। গাছ যেন ডাকিয়া বলে, "কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়ীতে এস। যদি পথ ভুলিয়া যাও, বাড়ী যদি চিনিতে না পার, সেজন্য নানা রঙের ফুলের নিশান তুলিয়া দিয়াছি। এই রঙ্গীন পাপড়িগুলি দূর হইতে দেখিতে পাইবে।" মৌমাছি ও প্রজাপতির সহিত গাছের চিরকালের বন্ধুতা। তাহারা দলে দলে ফুল দেখিলে আসে। কোন কোন পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখীর ভয়ে বাহির হইতে পারে না। পাখী তাহাদিগকে দেখিলেই খাইয়া ফেলে। রাত্রি না হইলে তাহারা বাহির হইতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য ফুল সন্ধ্যা হইলেই সুগন্ধ বিস্তার করে।

গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু

পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছি এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালনপালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া থাকে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছুদিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হুহু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত, ছোট ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙ্গিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়।

এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(১) গাছের জন্ম ও মৃত্যু আছে—উহা কে আবিষ্কার করিয়াছেন ? তাঁহার আবিষ্কার কাহিনী হইতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) গাছ কি প্রকার আহার গ্রহণ করে ?

(খ) গাছের গোড়ায় জল দিলে গাছের আহার গ্রহণ করিতে সুবিধা হয় কেন ?

(গ) গাছ মাটি হইতে কিসের সাহায্যে আহার গ্রহণ করে ?

(ঘ) অঙ্গারক বায়ু কাহাকে বলে ? ইহা গাছের কি কাজে লাগে ?

(ঙ) গাছ যে সর্বদা আলো পাইবার চেষ্টা করে, ইহার একটি প্রমাণ উল্লেখ কর।

২। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) "আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি।"—এখানে 'আমরা' কাহাদের বুঝাইতেছে ? এই কথাটি যে সত্য তাহা "গাছের জন্ম ও মৃত্যু" প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ কর।

(খ) "মৌমাছি আসে বলিয়া গাছের উপকার হয়?"—মৌমাছির দ্বারা গাছের কি উপকার হয় ?

(গ) এই ভাবে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ কি ভাবে মরিয়া যায় বর্ণনা কর।

(ঘ) অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাহাকে বলে ? এই যন্ত্র দিয়া গাছের মূল বা ডাল দেখিলে কি দেখা যায় ? তাহার দ্বারা গাছের কি উপকার হয় ?

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর :—(বন্ধনীর মধ্য হইতে শব্দ বাছিয়া লও।)

আমরাও — আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি। গাছ ফুলের মধ্যে —সঞ্চয় করে। — ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না। তাহাদিগকে আনিবার জন্য সন্ধ্যা হইতেই — বিস্তার করে। (মধু, সুগন্ধ, আলো, রেণু, পাতা, রঙ, নিশান)

(খ) যে বানানটি ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও :

শোসন, সোশন, শোষণ ; পরিক্ষা, পরীক্ষা, পরিখ্যা ; সরীর, শরির, শরীর ; অণুবিক্ষণ, অণুবীক্ষণ, অনুবিখখন।

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(ক) অর্থ লিখ : সতেজ, শক্তি, সঞ্চয়, শরীর, পদার্থ, আবশ্যক।

(খ) বিপরীতার্থক শব্দ লিখ :

ছোট, শ্বাস, জীবন, আনন্দ, রাত্রি, ক্ষুদ্র, বাঁচা, উপকার।

৫। সৃষ্টিধর্মী প্রশ্ন :

ব্যাখ্যা লিখ :

(ক) এখন বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল।

(খ) আনন্দের দিনে আমরা দশজনকে নিমন্ত্রণ করি। ফুল ফুটিলে গাছও তাহার বন্ধু-বান্ধবকে ডাকিয়া আনে।

———

পদ্যাংশ

প্রার্থনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তর-তর হে,
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।

জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তর-তর হে।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।

চরণ-পদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তর-তর হে।

অনুশীলনী

১। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ (মৌখিক)

(ক) কবি এই প্রার্থনা কাহার নিকট করিতেছেন ?

(খ) কবি তাঁহার অন্তরকে কি করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ?

(গ তোমার পাঠ্য-পুস্তকের 'প্রার্থনা' কবিতাটি কাহার লেখা ?

(ঘ) প্রার্থনা কবিতার প্রথম স্তবকটি মুখস্থ লিখ।

(ঙ) 'অন্তর-তর' কাহাকে বলা হইতেছে ? কেনই বা বলা হইতেছে ?

২। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সুন্দর উচ্চারণসহ কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) কবি এই প্রার্থনা কবিতায় কি প্রার্থনা করিতেছেন ?

৩। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

সরলার্থ লিখ ঃ

(ক) যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
মুক্ত করো হে বন্ধ।

(খ) জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে,
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।

অর্থ লিখ ঃ—অন্তর, নির্মল, নির্ভয়, নিঃসংশয়, ছন্দ, নিঃস্পন্দিত, নন্দিত।

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

চরণ পদ্মে — নিঃস্পন্দিত করো হে।

— করো, — করো — করো হে।

(খ) নিম্নে কতকগুলি শব্দ দেওয়া হইল। যেটি যাহার বিপরীত সেইটিকে তাহার ডাইনে বসাইয়া সাজাইয়া লিখ ঃ

অন্তর, নন্দিত, মঙ্গল, বিষণ্ণ, অমঙ্গল, বিযুক্ত, বাহির, নির্মল, যুক্ত, মলিন।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি

কবি কৃত্তিবাস ওঝা

আজ্ঞা পেয়ে রথ তবে জোগায় সারথি,
ভরত আনিতে রামে যান শীঘ্রগতি।
চিত্রকূট পর্বতে আছেন রঘুবর,
শুনিয়া ভরত তথা হন অগ্রসর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা,
বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা।
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে,
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে।
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর ;
তীর্থ-পর্যটনে অতি মলিন শরীর।
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে,
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে।
ভরত কহেন ধরি' রামের চরণ—
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ?
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে,
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে ?
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ ;
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।
অযোধ্যা ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।
চল প্রভু অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার ;
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার।"

শ্রীরাম বলেন, "তুমি ভরত পণ্ডিত,
না বুঝিয়া কেন বল, এ নহে উচিত।
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়,
বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়।
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য,
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবা প্রত্যক্ষ।"

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) রাম ও ভরতের কথোপকথনটি নিজের কথায় লিখ।

(খ) রামের প্রতি ভরতের ভক্তি প্রকাশ পায় এমন কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত কর।

২। **বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) "কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন ?"
—এই উক্তি কাহার ? কাহার প্রতি এই উক্তি ?

(খ) "বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে ?"
—'বামা' শব্দের অর্থ কি ? কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই উক্তি করা হইয়াছে ?

(গ) "মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায় ?"
—এই বিমাতা কে ? কাহার বিমাতা ? তাঁহার বিরুদ্ধে কে কি অনুযোগ করিয়াছেন ?

৩। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ**

(নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর বন্ধনীর ভিতর হইতে বাছিয়া লও।)

(ক) রামচন্দ্র কোন্ পর্বতে বাস করিতেছিলেন ? (চিত্রকূট, হিমালয়, বিন্ধ্য)

(খ) কিজন্য ভরত ক্লান্ত হইয়াছিলেন ? (পৃথিবী ভ্রমণ, তীর্থ-পর্যটন, গিরি আরোহণ)

(গ) কাহার বাক্যে রাম বনে গিয়াছিলেন ? (মাতৃবাক্যে, পত্নীবাক্যে, পিতৃবাক্যে)

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) অর্থ লিখ ঃ গলবস্ত্র, পর্ণশালা, দাসবৎ, মনঃক্লেশ, অনুযোগ, অপরাধ, দীনবেশে, সারথি।

(খ) গদ্যরূপ লিখ ঃ নির্মাইয়া, প্রবেশে, আইলাম, দেখিবা।

(গ) নিজ বাক্যে ব্যবহার কর ঃ
দেশান্তরে, দীনবেশে, স্বভাবত, অনুসারে।

(ঘ) সরলার্থ লিখ ঃ

(১) অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ,
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ।

(২) চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য,
অযোধ্যা যাইব আমি, দেখিবা প্রত্যক্ষ।

বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে,
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু !—উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য বলে পেয়ে সে মহা-পর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে, কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিংকরী,
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরু দল, দাসরূপ ধরি,
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে !

অনুশীলনী

১। **বস্তুমুখী প্রশ্ন**ঃ (মৌখিক)

(ক) 'বিদ্যাসাগর' কবিতাটি কাহার লেখা ? তাঁহার রচিত একখানি বিখ্যাত কাব্যের নাম কর।

(খ) এই 'বিদ্যাসাগর' কে ? তাঁহার পূর্ণ নাম ও পিতার নাম কি ?

(গ) এই কবিতাটিতে 'বিদ্যাসাগর' মহাশয়ের সহিত কাহার তুলনা করা হইয়াছে, তুলনাটি বুঝাইয়া দাও।

২। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) তরুদল পথিককে আশ্রয় দিয়া কি কি সুবিধা দান করে ?

(খ) দীন ব্যক্তিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কিরূপ সমাদর পাইয়া থাকিতেন ?

৩। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সরলার্থ লিখ ঃ

(১) করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে, দীন যে।

(২) পরিমলে ফুল-কুল, দশদিশ ভরে।

(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল ঃ

সিন্ধু, হেমকান্তি, সুবর্ণ, গিরীশ, সদন, পরিমল, কিঙ্করী।

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) কবিতাটি পড়িয়া 'স্বর্ণ' ও 'পর্বতের' একটি করিয়া প্রতিশব্দ বাহির কর।

(খ) অর্থগত পার্থক্য লিখ ঃ
দীন, দিন ; গিরিশ, গিরীশ ; কুল, কূল।

চল্ চল্ চল্

কাজী নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্ ।
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত—
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল ।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ।

চল্‌রে নওজওয়ান,
শোন্‌রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান ।

ভাঙরে ভাঙ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

অনুশীলনী

১। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ—(মৌখিক)

(ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) এই কবিতাটি কার লেখা? এই কবির আর একটি কবিতার নাম বল।

২। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) নওজোয়ানদের কি কি কাজ করিবার জন্য কবি আহ্বান করিতেছেন?

(খ) নওজোয়ানদের সঙ্গে লইয়া কি কি কাজ করিবার জন্য কবি শপথ গ্রহণ করিতেছেন?

৩। সৃজনধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(১) নব-নবীনের গাহিয়া গান······বাহুতে নবীন বল।

(২) মৃত্যু তোরণ দুয়ারে······আহ্বান।

(খ) অর্থ লিখ ঃ

অরুণ, তিমির, ঊষা, তোরণ, আগল।

(গ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রত্যেকটি ব্যবহার করিয়া এক-একটি বাক্য রচনা কর ঃ

মাদল, টুটাবো, উতলা, নওজোয়ান।

(ঘ) হানি, টুটাবো, দানিব—এইগুলিকে গদ্যে প্রকাশ কর।

কৃপণের দান

কালিদাস রায়

টাকার কুমীর প্রেমদাস সাউ কঞ্জুস ছিল বড়,
ছাড়িত না সুদ একটি পয়সা যত হাতে পায়ে ধরো।

তুলসীর মালা গলায় তাহার হরিনাম ঝোলা হাতে,—
সুদের হিসেব করিতে করিতে বেড়াতো উঠানে ছাতে।

একমুঠি কেহ ভিক্ষা চাহিলে লাঠি নিয়ে যেত তেড়ে,
আধপেটা খেয়ে, টেনা প'রে টাকা মাটিতে রাখিত গেড়ে।

সহসা একদা—ভগবান্ কারে নিয়ে যা'ন কোন্ দিকে,—
তার আজীবন-সঞ্চিত ধন খয়রাতে দিল লিখে।

ডাক্তারখানা, টোল, ইস্কুল, দেউল, অতিথিশালা,
নির্মাণ তরে দিল সব, শুধু রেখে ঝোলা আর মালা।

নামাবলী গায় কাঁথাখানি ঘাড়ে, 'শ্রীরাধামাধব' ব'লে,
প্রেমদাস সাউ গেলেন সহসা শ্রীবৃন্দাবন চ'লে।

যার নাম কেউ করিত না ভয়ে, কভু পাছে হাঁড়ি ফাটে,
শতবার তার নাম না করিয়া কারো দিন নাহি কাটে।

চিরদিনকার অভাব ঘুচে না মুষ্টি ভিক্ষা পেয়ে,
অনেক কৃপণই দেশের বন্ধু যোগী ও ভোগীর চেয়ে।

কৃপণের ঘরে কুহরে কোটরে দেশের বিত্ত জমে ;
তাতে হয় লাভ সমূলে অভাব ঘুচে তায় ক্রমে ক্রমে।

চন্দন তরু একটিও ফল দেয়নি ক্ষুধিতে ভুলে,
একটিও ফুল ফুটায়ে কখনো তুষেনিক অলিকুলে।

দুর্গম মূলদেশে তার কেউ পায়নি শীতল ছায়া,
ব্যাঘ্র-শাসিত কানন তাহার সর্পে ভূষিত কায়া।

একদা তাহার সারা দেহ ভার নিবেদিল অকাতরে,
দারুভূত ঐ নিবিড় ভক্তি পলে পলে রস ক্ষরে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) কৃপণ প্রেমদাস সাউর সহিত কাহার সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে? উভয়ের স্বভাবের সাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর।

(খ) পূর্বে প্রেমদাস সাউর নাম করিতে লোকে ভয় পাইত কেন? এখন লোকে শতবার তার নাম করে কেন?

(গ) "অনেক কৃপণই দেশের বন্ধু যোগী ও ভোগীর চেয়ে।"—'কৃপণের দান' কবিতা হইতে এই উক্তিটি প্রমাণিত কর।

২। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সরলার্থ লিখ ঃ (১) সহসা একদা···খয়রাতে দিল লিখে।
(২) একদা তাহার সারা দেহভার···রস ঝরে।

(খ) গদ্যরূপ লিখ ঃ তেড়ে, চ'লে, ব'লে, ঘুচে, নিবেদিল, তুষেনিক।

(গ) অর্থ লিখ ঃ কঞ্জুষ, আজীবন, অতিথিশালা, অলিকূলে, দারীভূত, কুহরে।

(ঘ) নিজের ভাষায় বাক্য রচনা কর ঃ
টাকার কুমীর, খয়রাতে, হাঁড়ি ফাটে, সমূলে, পলে পলে, কুহরে-কোটরে।

৩। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রেমদাস সাউ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ দিয়া কি কি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছিলেন?

(খ) 'নামাবলী' শব্দের অর্থ কি?

(গ) প্রেমদাস শেষে কোথায় চলিয়া গেলেন? তিনি সঙ্গে কি লইয়া গেলেন?

৪। মৌখিক প্রশ্ন ঃ

(ক) 'কৃপণের দান' কবিতায় যে অংশে প্রেমদাসের জীবনযাপনের অভ্যাস বর্ণিত আছে, সেই অংশটি মুখস্থ বল।

(খ) প্রেমদাস সাউর দানের বিবরণ অংশটি আবৃত্তি করিয়া শোনাও।

মূল্যপ্রাপ্তি

(অবদানশতক)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশির ঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া—
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটি ফুটেছে কি করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদ দ্বারে
মাগিল রাজার দরশন—
হেন কালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন,
'অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব,
কত মূল্য লইবে ইহার ?
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুর মাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।'
মালী কহে, 'এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।'
পথিক চাহিল তাহা দিতে।
হেনকালে সমারোহে বহু পূজা অর্ঘ্য বহে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিৎ উচ্চারি মঙ্গল গীত
চলেছেন বুদ্ধ দরশনে—
হেরি অকালের ফুল শুধালেন, 'কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।'
মালী কহে, 'হে রাজন্, স্বর্ণ মাষা দিয়ে পণ
কিনেছেন এই মহাশয়।'

'দশ মাষা দিব আমি' কহিলা ধরণী স্বামী,
'বিষ মাষা দিব' পান্থ কয়।
দোঁহে কহে 'দেহো দেহো', হার নাহি মানে কেহ
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত।
কহিল সে করজোড়ে 'দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।
এত বলি ছুটিল সে যেথা রয়েছেন বসে
বুদ্ধদেব উজলি কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্য জ্যোতি।
সুদাস ভূতলে পড়ি, পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণ পদ্ম 'পরে।
বরষি অমৃত রাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহ বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু, আর কিছু নহে
চরণের ধূলি এক কণা।'

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন :

'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতা হইতে নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) ফুলটি কাহার সরোবরে ফুটিয়াছিল ?

(খ) সে ফুলটি কি করিতে চাহিল ?

(গ) ফুলটি কে লইতে চাহিল ও কেন ?

(ঘ) "মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত",
—কিভাবে ক্রমাগত মূল্য বাড়িয়া উঠিল নিজের কথায় লিখ।

(ঙ) ক্রমাগত মূল্য বাড়িয়া উঠিলে মালী কি ভাবিল ও কি করিল ?
(চ) মালী বুদ্ধের নিকট কি চাহিল ?

২। 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতাটির কাহিনী নিজের কথায় লিখ।
(১নং প্রশ্নের উত্তরগুলির সাহায্য গ্রহণ করিতে পার।)

৩। বস্তুমুখী প্রশ্ন :

(ক) 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতাটি কাহার লেখা ?
(খ) "নৃপতি বাহিরে' আচম্বিতে"
—এই নৃপতির নাম কি ?
(গ) "কহ বৎস কি তব প্রার্থনা ?"
—এই উক্তি কাহার ? এই প্রশ্নের উত্তরে কে কি বলিল।
(ঘ) "এক মাষা স্বর্ণ পাবো মনে আশা"
—এইটি কাহার উক্তি ? সে এই স্বর্ণ কিজন্য পাইবে ?

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(ক) সরলার্থ লিখ : (১) মালী ভাবে···পাবো কত।
(২) প্রভু, আর কিছু নহে···এক কণা।
(খ) নিম্নলিখিত শব্দগুলির গদ্যরূপ লিখ :
তুলি লয়ে, হেরি, শুধালেন, বেচিতে, বাহিরে।
(গ) অর্থ লিখ : হেনকালে, দোঁহে, অর্ঘ্য, সমারোহে, আচম্বিতে, করজোড়ে।

———

মা

রজনীকান্ত সেন

স্নেহ বিহ্বল, করুণা ছল ছল
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে ?
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে অশরণ লাগিরে।

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে,
আত্মহারা, সাদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মন করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি
বদন-পানে চেয়ে থাকিরে।

করুণা বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল
ব্যথিত মস্তকে চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে আশিস্ দেয় মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে।

আপনি মঙ্গলা মাতৃরূপে আসি
শিয়রে দিল দেখা করুণা পরকাশি ;
বক্ষে ঝরে চির পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয় শিশু—অসীম-নির্ভর,
নমো নমো নমঃ জননী দেবী মম।
অচলা মতি পদে মাগিরে।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) 'মা' কবিতাটিতে সন্তানের প্রতি মা'র স্নেহ কখন প্রকাশ পাইয়াছে নিজের কথায় লিখ।

(খ) কবিতার শেষে কবি মাতার নিকট কি চাহিয়াছেন ?

২। **সৃজনমুখী প্রশ্ন :**

(১) সরলার্থ লিখ : (ক) মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে অশরণ লাগিরে।
(খ) আপনি মঙ্গলা—করুণা পরকাশি।

(২) অর্থ বল :
সঞ্জীবনী সুধা, অশরণ, বদন, সুপ্ত, পীযূষ।

(৩) গদ্যরূপ লিখ :
এসেছে, তুলি, মুছায়ে, পরকাশি।

৩। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :**

(ক) বন্ধনীর মধ্য হইতে শব্দ লইয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :
অবশ — তনু মলিন —,
আত্মহারা — বিমুখী — সুখে
তপ্ত — মন — ভরা বুকে।
(অনশনে, তনু, কৃশ, নিজ, সদা, করুণা, জাগরণে, অশরণ)।

(খ) বিপরীতার্থক শব্দগুলি যথাযথ সাজাও :
সুধা, স্থূল, সুখে, কৃশ, সুপ্ত, অসীম, গরল, দুঃখে, জাগ্রত, সসীম।

(গ) যে বানানটি শুদ্ধ তাহার নীচে দাগ দাও :
অসরণ, অশরণ, অশরন ; ব্যাথিত, ব্যাথীত, ব্যথিত, ; অসীম, অসিম, অশিম ; সান্তনা, সান্তবনা, শান্তনা ; পিযূষ, পিজুস, পীযূষ।

৪। **মৌখিক :** 'মা' কবিতাটির প্রথম ছয় পঙ্‌ক্তি মুখস্থ বল।

মোছ আঁখি

চিত্তরঞ্জন দাশ

মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ।
রাবণের চিতা সম যদিও আমার
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ ;—কেন গো ক্রন্দন ;
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে ;
হাসি আবরণ টানি দুঃখ ভুলে যাও।
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে
বাসনার স্তর ভাঙ্গি, বিশ্বে ঢেলে দাও,
হায়, হায় ! জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম-কলি নয়ন-কিরণে,
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রেম ঢেলে দিলে বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে ব্যর্থ জীবন-সাধনা ;
জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**
(ক) এই কবিতায় কবি কাহার আঁখি মুছাইতে উপদেশ দিতেছেন ? সম্পূর্ণ উপদেশটি নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।
(খ) মানুষের জীবনে সার্থকতা লাভ হয় কিসে ?

২। **সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ**
(১) সরলার্থ লিখ ঃ (ক) "জনম বিশ্বের তরে, পরার্থে কামনা।"
(খ) "রবেণের চিতা সম যদিও আমার—
জ্বলিছে জ্বলুক প্রাণ।"
(২) অর্থ লিখ ঃ বিশাল, প্রাঙ্গণ, আবরণ, অশ্রু, পরার্থে, ক্রন্দন, কুসুম, প্রেম।

৩। **নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ** শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ
জীবনের — অশ্রু মুছাইতে
বাসনার—ভাঙ্গি, — ঢেলে দাও।

দেবতার স্থান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ভিখারী ঘুমায়েছিল মন্দিরের ছায়ে ;
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম চীৎকার ধ্বনিতে,
জাগিয়া, চাহিয়া দেখে, পূজারী দাঁড়ায়ে,—
গালি পাড়ে, ক্রোধে যায় ধাইয়া মারিতে।
বিস্ময়ে ভিখারী বলে, "গোঁসাই ঠাকুর !
বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি,
ভিক্ষা মেগে ফিরিয়াছি সারাটি দুপুর,
শ্রান্ত বড়, তাই হেথা শুয়েছিনু খালি।"

রুষিয়া পূজারী কহে, "চুপ বেটা চোর—
নীচ জাতি,—জান না এ দেবতার ঠাঁই ?
মন্দিরের অভিমুখে পা রাখিয়া তোর—
এটা হ'ল আরামের ঠাঁই ? কি বালাই !"
সে বলে, "পা লয়ে তবে কোথা আমি যাই,
এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই।"

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভিখারী কোথায় ঘুমাইয়াছিল ?

(খ) পূজারী তাহাকে গালি দিল কেন ?

(গ) ভিখারী পূজারীকে কি উত্তর দিল ?

(ঘ) "বুঝিতে না পারি মোরে কেন দাও গালি ?"
—এই উক্তি কাহার। সে কি বুঝিতে পারে নাই ?

(ঙ) "জান না এ দেবতার ঠাঁই।"
—এ কাহার উক্তি ? কাহার প্রতি এই উক্তি ? সে কি উত্তর দিল ?

২। সৃজনধর্মী প্রশ্ন ঃ
'দেবতার স্থান' কবিতাটির কাহিনী নিজের কথায় লিখ। (১নং প্রশ্নে ছোট ছোট প্রশ্নগুলির উত্তর হইতে সাহায্য লইতে পার।)

৩। সৃষ্টিধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) সরলার্থ লিখ ঃ
"এ জগতে সকলি যে দেবতার ঠাঁই।"

(খ) অর্থ লিখ ঃ
শ্রান্ত, পূজারী, ঠাঁই, ক্রোধে, রুষিয়া, বালাই, অভিমুখে।

৪। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ
বন্ধনীর মধ্য হইতে বাছিয়া গদ্যরূপ দাও ঃ
ছায়ে, দাঁড়ায়ে, মোরে, শুয়েছিনু, ঠাঁই।
(স্থান, আমাকে, ছায়ায়, দাঁড়াইয়া, শুইয়াছিলাম, ঠিকানা)

সিপাহী বিদ্রোহ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ—"হো-হো, হো-হো, হো-হো"
চমকে সবাই তাকিয়ে দেখে—সিপাহী বিদ্রোহ !

আগুন হয়ে সারাটা দেশ ফেটে পড়ল রাগে,
ছেলে বুড়ো জেগে উঠল নব্বই সন আগে,
একশো বছর গোলামিতে সবাই তখন ক্ষিপ্ত,
বিদেশীদের রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত।

নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী—
সবার হাতে অস্ত্র ; নাচে বনের পশু-পক্ষী।
কেবল ধনী, জমিদার, আর আগের রাজার ভক্ত
যোগ দিল, তা নয়কো, দিল গরীবেরাও রক্ত !

সবাই জীবন তুচ্ছ করে, মুসলমান ও হিন্দু,
সবাই দিতে রাজী তাদের প্রতি রক্তবিন্দু ;
ইতিহাসের পাতায় তোমরা পড় কেবল মিথ্যে ;
বিদেশীরা ভুল বোঝাতে চায় তোমাদের চিত্তে।
অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড,
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।

নানা জাতের নানান সেপাই গরীব এবং মূর্খ ;
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ ;
তাইতো তারা স্বাধীনতার প্রথম লড়াই লড়তে ;
এগিয়েছিল, এগিয়েছিল মরণ বরণ করতে।

আজকে যখন স্বাধীন হবার শেষ লড়াইয়ের ডঙ্কা
উঠছে বেজে, কোনো দিকেই নেইকো কোনো শঙ্কা ;
জব্বলপুরে সেপাইদেরও উঠছে বেজে বাদ্য
নতুন ক'রে বিদ্রোহ আজ ; কেউ নয়কো বাধ্য,
তখন এঁদের স্মরণ করো স্মরণ করো নিত্য—
এঁদের নামে, এঁদের পণে শানিয়ে তোলো চিত্ত।
নানাসাহেব, তাঁতিয়াটোপি, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মী,
এঁদের নামে, দৃপ্ত কিশোর, খুলবে তোমার চোখ কি ?

[বিঃ দ্রঃ শিক্ষক মহাশয় সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাটি বুঝাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদিগকে বলিবেন।]

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) "বিদেশীর রক্ত পেলে তবেই হবে তৃপ্ত !" এই বিদেশী কাহারা ? কাহারা বিদেশীর রক্ত পেলে তৃপ্ত হবে ? কাহারা তাহাদের নেতা ছিলেন ?

(খ) "অত্যাচারী নয়কো তারা, অত্যাচারীর মুণ্ড
চেয়েছিল ফেলতে ছিঁড়ে জ্বালিয়ে অগ্নিকুণ্ড।"
—অত্যাচারী কাহারা নয় ? প্রকৃত অত্যাচারী কাহারা ? অত্যাচারীর মুণ্ড কাহারা ছিঁড়িয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল ?

(গ) "তখন এঁদের স্মরণ করো, স্মরণ করো নিত্য।"
—কবি কাহাদের স্মরণ করিতে বলিতেছেন ? কেনই বা স্মরণ করিতে বলিতেছেন ?

২। **বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়াছিল কেন ?
(খ) সিপাহী বিদ্রোহে কাহারা যোগ দিয়াছিল ?
(গ) ইতিহাসে কিরূপ মিথ্যা পড়া যায় ?
(ঘ) প্রকৃতপক্ষে 'সিপাহী বিদ্রোহ' ঘটনার সত্যরূপ কি ?
(ঙ) পরবর্তী স্বাধীনতা যুদ্ধকালের কয়েকজন নেতার নাম কর।

৩। মৌখিক প্রশ্ন :

(ক) "সিপাহী বিদ্রোহ"কে পরবর্তীকালে কি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?

(খ) 'সিপাহী বিদ্রোহ' কবিতার লেখকের নাম কি ?

(গ) সিপাহী বিদ্রোহে কাহারা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন ?

৪। সৃজনমুখী প্রশ্ন :

(ক) অর্থ লিখ : গোলামি, তুচ্ছ, আওয়াজ, ডঙ্কা, শঙ্কা, দুপ্ত, রাজী, লড়াই, চিত্ত, নিত্য।

(খ) সরলার্থ লিখ :

নানা জাতের নানান্ সেপাই গরীব এবং মূর্খ
সবাই তারা বুঝেছিল অধীনতার দুঃখ।

৫। মৌখিক প্রশ্ন :

"ছেলে বুড়ো জেগে উঠলো নব্বই সন আগে ?"

(ক) কবে হইতে নব্বই সন আগে ? (খ) সিপাহী বিদ্রোহ কত খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। (গ) এই কবিতাটি কত খৃষ্টাব্দে লেখা বলিয়া মনে হয় ?

কিশোর স্বপ্ন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আমরা কিশোর, আমরা নবীন, পথকে ভালোবাসি,
তাইতো ঘরে মন বসে না ; কল্পনা যায় ভাসি
দূর থেকে ওই দূরান্তরে সাত সাগরের পারে—
ভল্‌গা নদীর কূলে কূলে, তংগানিকা'র ধারে।
'রাইন' নদীর তীরে ডাকে ঘন পাইন বন,
জাপান থেকে চেরি ফুলের আসে নিমন্ত্রণ ;
বরফ-ঢাকা দেশে যেথায় বল্গা হরিণ চরে,
বর্শা দিয়ে এস্কিমোরা তিমি শিকার করে,
সাদা ভালুক পেংগুইন আর মেরুজ্যোতির দেশ,—
সেইখানে মন বারে বারে হয় যে নিরুদ্দেশ।
আমেরিকার ঘাসের বনে বুনো ঘোড়ার দল—
পিঠে তাদের লাফিয়ে চড়ি আনন্দে চঞ্চল।
বন্য মহিষ শিকার ক'রে বনে বনান্তরে।
শিকারীদের সঙ্গে ফিরি তপ্ত কলেবরে।
কখনো বা আফ্রিকাতে কাফ্রি ছেলের সাথে
সিংহ মারি রক্ত-মাখা সড়কিখান হাতে।
আমরা কিশোর, আমরা কাঁচা, আমরা নবীন দল,
বাঁধন-হারা আমরা নদী তরঙ্গে উচ্ছ্বল।
কুটির বাঁধি কীর্তিনাশার মরণ ভরা কূলে—
ক্ষিপ্ত জলের ধারা যেথায় উঠ্‌ছে দুলে দুলে।
শান্তি। তারে কে চায় বল ? বিপদ-রমণীয়।
ঘরের চেয়ে পথের কাঁটা তাই আমাদের প্রিয়।

জানার চেয়ে অজানা যে তারেই ভালো লাগে ;
পরাণখানি তাইতো কাঁদে দূরের অনুরাগে।
দূরকে ভালোবেসে মোদের তিক্ত হলো ঘর ;
দিগন্ত যে আপন হ'লো, নিকট হ'লো পর।

অনুশীলনী

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কিশোরের প্রাণ কিসের জন্য কাঁদে ?
(খ) কিশোর ঘর ছাড়িয়া কোথায় যাইতে চায় ?
(গ) "তাইতো ঘরে মন বসে না",
—কাহার মন বসে না ? তাহার মন কোথায় যাইতে চায় ?
(ঘ) "শান্তি ! তারে কে চায় বল ?
—কে শান্তি চায় না ? সে কি চায় ? কি পাইয়া তার আনন্দ ?

২। **বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) সাত সাগরের পারে কিশোর কোথায় যাইতে চায় ?
(খ) জাপান হইতে তাহার নিকট কিসের নিমন্ত্রণ আসে ?
(গ) বরফ-ঢাকা দেশে সে কি পাইবে ?
(ঘ) আমেরিকার ঘাসের বনে সে কি করিবে ?
(ঙ) আফ্রিকাতে গিয়ে সে কি করিবে ?
(চ) কীর্তিনাশার কুলে সে কি করিবে ?

৩। **নিম্নলিখিত কথাগুলির পরিচয় দাও ঃ**

এস্কিমো, কীর্তিনাশা, কাফ্রি, পেঙ্গুইন।

৪। **সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) অর্থ বল ঃ নবীন, নিরুদ্দেশ, মেরু-জ্যোতি, ক্ষিপ্ত, অনুরাগ, তিক্ত।
(খ) সরলার্থ লিখ ঃ
(১) আমরা কিশোর, আমরা কাঁচা, আমরা নবীন দল।
বাঁধন-হারা আমরা নদী তরঙ্গে উচ্ছ্বল।
(২) দূরকে ভাল বেসে মোদের তৃপ্ত হলো ঘর।
দিগন্ত সে আপনা হলো, নিকট হলো পর।

ধন-ধান্যে-পুষ্পে-ভরা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা ;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি ,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় এমন উজ্বল ধারা ।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে !
তার পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে ।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥

এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে ।
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ।
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমায় এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি” ।—কবি এই কথা কেন বলিয়াছেন ?

(খ) এই দেশ সকল দেশের সেরা কেন ?

(গ) প্রকৃতির কিরূপ শোভা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে ?

(ঘ) কবির জীবনে কামনা কি ?

(ঙ) "ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।" এই দেশকে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বলা হইয়াছে কেন ?

(চ) "ভায়ের মায়ের এত স্নেহ",—এই দেশে ভাই ও মা-র স্নেহ যে বেশী তোমার জানা কোন কাহিনী হইতে দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

২। (ক) কবিতাটি আবৃত্তি কর।

আবৃত্তি সঙ্কেত ঃ—ধ-ন-অ ধা-আ-ন্যে পু-উ-ষ্পে ইত্যাদি।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

এমন — নদী কাহার, কোথায় এমন — পাহাড়,
কোথায় এমন — ক্ষেত্র, আকাশ-তলে — ।

৩। সৃষ্টিধর্মী প্রশ্ন ঃ

সাধু ভাষায় রূপান্তরিত কর ঃ

ভরা, সেরা, ঘেরা, মেশে, উজল, ঢেউ।

———

বাংলা দেশ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।

কোথায় ডাকে দোয়েল শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে—
মরালী তার পাছে পাছে।
বাবুই কোথায় বাসা বোনে—
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ।
আমাদেরি বাংলা রে।

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল করি' তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুন্‌তে পাব—
বাউলের সুরে মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরি বাংলা রে।

কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা—
সবার অধিক পাই রে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়—
বেড়ে ওঠে মোদের বুক ?
মোদের পিতৃ পিতামহের—
চরণ-ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে।

অনুশীলনী

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) বাংলা দেশকে কবি কি কি গুণে গৌরবময় মনে করিতেছেন ?

(খ) "কোন্ ভাষা মরমে পশি আকুল করি তোলে প্রাণ ?"—এই ভাষা কোন্ ভাষা ? এ ভাষা কবির প্রাণকে আকুল করে কেন ?

(গ) "চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজেরে ?"—চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কি জান ?

২। সৃজনমুখী প্রশ্ন ঃ

সরলার্থ লিখ ঃ

(ক) চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ
কোথায় বাজেরে ?

(খ) কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
সবার অধিক পাইরে দুখ্ ?

(গ) অর্থ লিখ ঃ—শ্যামল, কমল, কোমল, বারি, দুর্দশা, পিতামহ।

৩। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) বাংলা দেশ কবিতাটি আবৃত্তি কর।

(খ) কবিতার যে অংশে পাখীদের কথা আছে সেই অংশটি মুখস্থ বল।

৪। বস্তুমুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) বাংলা দেশের কয়েকটি সুকণ্ঠ পক্ষীর নাম কর।

(খ) বাবুই পাখীর বাসা বোনার বৈশিষ্ট্য কি ?

(গ) বাউল সুর কাহাকে বলে ?

মূল্য : ৪ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র